BanglaBook.org

এক

উনিশশো চোদ্দ সালের দোসরা আগস্ট।

ওয়েস্ট রুজবেক, বেলজিয়াম।

বাগানে বসে আছি আমি, মা আর আমার ছোট ভাই। আমাদের বাড়িটা পাহাড়ের একেবারে কোল ঘেঁষে বলে সন্ধ্যা নেমেছে আগেভাগে। সূর্যের শেষ আলোয় জ্বলছে পাহাড়ের চুড়োটা।

'মার্থা, চিনিটা দে তো!'

মায়ের দিকে চিনির পট বাড়িয়ে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। কাপটা নামিয়ে রাখার আগেই ঘটাং করে শব্দ হলো সদর দরজায়। চোখ ফেরাতেই দেখি, বাবা। উত্তেজিত। তাড়াতাড়ি কাপ রেখেই ছুটলাম। নিশ্চয়ই গুরুতর ব্যাপার। তা না হলে বাবা কখনও এত উত্তেজিত হয় না।

'বেলজিয়াম আক্রমণ করেছে জার্মানী,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বাবা, 'কিং অ্যালবার্ট জেনারেল মবিলাইজেশনের অর্ডার দিয়েছেন। মানেটা বুঝেছ? সমর্থ সব পুরুষকেই যুদ্ধে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, অত চিন্তার কি আছে,' যেন পাঁচটা টাকা হারানোর খবর শুনছে, এমন ভঙ্গিতে বলল মা, 'জামা-কাপড় বদলে এসো। টেবিলে খাবার দিচ্ছি, খেয়ে নাও আগে।'

মা'র দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে এক সময় হেসে ফেলল বাবা। সাথে সাথে আমরাও।

'তুমি অত ভাবছ কেন,' বাবাকে খাবার বেড়ে দিতে দিতে নিশ্চিন্ত গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করল মা। 'আমাদের কি সৈন্য নেই নাকি? দেখো, দু'দিনেই সোজা করে ফেলবে ওদের। আর দরকার পড়লে ফরাসীরা আসবে। তখন দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালাবার রাস্তা খুঁজে পাবে না জার্মানরা।'

দিন দু'য়েক যেতেই বোঝা গেল লেজ গোটাতে হয়েছে ঠিকই, তবে সেটা আমাদের সৈন্যদের। ক্রমাগত এগিয়ে আসছে জার্মান বাহিনী। জার্মান সেনাপতি লুডেন ডুফের বুটের লোহার তলা সমস্ত বাধাকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সাথে। দুর্ভেদ্য বলে লীজ আর নামুরের যেসব সীমান্তদুর্গের নাম শুনেছিলাম সেখানে নাকি খুঁজলে কিছু ইঁটের টুকরো মিলতে পারে এখন।

আমার তিন ভাইকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। সেদিন থেকেই বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে হাসি। মা বিষণ্ণ মুখে এঘর-ওঘর করে সারাক্ষণ। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

একদিন খবর পেলাম ফরাসীরা এসেছে, তারপরই শুনলাম ইংরেজরাও। খুশি হয়ে উঠলাম সবাই। এবার মজাটা টের পাবে জার্মানরা। কিন্তু দিনকয়েক লাগল খুশিটা উবে যেতে। জার্মানদের দুর্বার গতিকে ঠেকাতে পারেনি বেলজিয়াম, ফরাসী আর ইংরেজ সৈন্যরা।

খুব ভোরে উঠেছি একদিন। অনেক দূর থেকে কিসের যেন অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ খেয়াল করতেই বুঝলাম, শব্দটা কামানের। আসছে জার্মান বাহিনী। দুর্বার গতিতে। ইংরেজ, ফরাসী আর বেলজিয়ামের সম্মিলিত

বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে। পরদিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল শব্দ। তারপর দিন আরও।

পরদিন ভোরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। মানুষ আসছে। বন্যার ঢলের মত মানুষের মিছিল। উদ্বাস্তু। যে যা পেরেছে সাথে নিয়েছে। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে রুগ্ন, বৃদ্ধ, ক্লান্ত, পরাজিত মানুষ। হাসি নেই, কথা নেই, শুধু সামনে চলা। কোথায়, কেউ জানে না।

দুপুরের মধ্যেই আশপাশের বেশ ক'টা পরিবার রওনা হয়ে গেল ওদের সাথে। কামার ভারভিলকে এতদিন সবার গলা ছাপিয়ে বলতে শোনা যেত, 'সর্বশেষ যে লোকটি গ্রাম ছেড়ে যাবে, সে হচ্ছে এই ভারভিল।' দেখা গেল, ঠেলাগাড়িতে জিনিস-পত্র চাপিয়ে নতুন বউয়ের হাত ধরে সে-ই রওনা দিয়েছে সবার আগে।

আমরা থেকে গেলাম তবুও। প্রতিদিন ভোরে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি। লোকজনের যাওয়া দেখি, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি ওদিকের অবস্থা সম্পর্কে। একদিন দাঁড়িয়ে আছি, দেখি, একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছে। তাকাতেই চোখাচোখি হলো মেয়েটার সাথে। কোলে একটা বাচ্চা। আমাকে দেখে কেন যেন গাড়ি থামাল ও। বাচ্চা কোলে গাড়ি থেকে নেমে এল। কাছে এসে অত্যন্ত সঙ্কোচমাখা গলায় বলল, 'কিছু মনে কোরো না, বোন, একটু দুধ দিতে পারো আমার বাচ্চাটার জন্যে? দুটো দিন পানি ছাড়া কিছুই প্রায় দিতে পারিনি ওকে। তবে...' একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে বলল মেয়েটা, 'আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই।'

'না না, পয়সা লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বললাম আমি, 'এসো, ভেতরে এসো।' দরজা খুলে দিলাম।

মেয়েটা গাড়ি থেকে তার আরেকটা বাচ্চাকে নিয়ে এল। ওদের বসিয়ে সোজা চলে গেলাম রান্নাঘরে, 'মা, একটু দুধ আছে?'

'কেন, খাবি?'

'না, মা, দুটো বাচ্চা আর ওদের মা দু'দিন থেকে খায়নি কিছুই। ওদের দেব।'

মা তাড়াতাড়ি যতটুকু দুধ ছিল তার সবটুকু দুটো বাটিতে ঢেলে দিল। সাথে মেয়েটার জন্যে কিছু খাবার।

বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সাথে নিজের খাবার হাতে নিল মেয়েটা। বলল, 'আপনাদের অনেক অসুবিধা করলাম।'

'তা কেন হবে,' প্রতিবাদ করল মা, 'কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব না?'

মেয়েটা কিছু না বলে খেতে শুরু করল। ওর খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কথা বলো, শুনি। কি হয়েছিল?'

'মাত্র একমাস আগে ফসল তুলেছিলাম আমরা,' এটুকু বলতেই গলা ভারি হয়ে এল মেয়েটার, 'আমার স্বামী খেত-খামার দেখাশোনা করত। তারপর রাজার হুকুমে যেতে হলো যুদ্ধে। সেই থেকে ওর আর কোন খবর জানি না।' টপ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে। হাতের উল্টোদিক দিয়ে মুছে নিয়ে ভেজা গলায় বলতে লাগল, 'চার পাঁচ দিন আগে গ্রামে এল জার্মান সৈন্য। এক সময় ঢুকল আমাদের বাড়িতে। ঢুকেই সামনে পেল আমার শ্বশুরকে। বুড়ো মানুষ। বারান্দায় বসে ছিল। কতবার বললাম, ভেতরে থাকতে। কানেই তুলল না। শুধু বলে,' 'আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে কিছু করবে না।' 'দেখার সাথে সাথে গুলি করল ওকে। আমার শাশুড়ি এ অবস্থা দেখে পাগলের মত ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল ঘর থেকে। দরজাও পার হলো না, গুলি খেয়ে ঠাস্ করে পড়ে গেল বারান্দায়। এর পরই ঘরে ঢুকল শয়তানগুলো। ঘরে ঢুকে...।' কথাটা শেষ করতে পারল না ও। প্রচণ্ড কষ্টে চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। মুখ ঢাকল দু'হাতে। মা আস্তে করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। অনেকক্ষণ পর একটু শান্ত হলো। মুখ তুলে ভাঙা গলায় বলল, জ্ঞান ফিরলে দেখি মেয়ে দুটো

আমার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে কাঁদছে। কোনরকমে উঠে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।'

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এক সময় বলল, 'তুমি, মা, আমাদের এখানেই থেকে যাও।'

'তা হয় না, মা,' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ও, 'তাছাড়া জার্মানরা খুব শিগগিরই এসে পড়বে এখানে। তার চেয়ে রিফিউজী ক্যাম্পে যাই। দেখি, কিভাবে দিন কাটে ওখানে!' চোখের জলে পথ ভিজিয়ে চলে গেল ও।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম, আমাদের গ্রামে ঢোকার সময় হয়ে এসেছে জার্মান বাহিনীর। দলে দলে পিছু হটে আসছে ইংরেজ আর ফরাসী সৈন্য। ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে আর শুকনো মুখে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

সেদিন সকাল থেকেই কেন যেন খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখলাম সৈন্যদের মধ্যে। যতদূর চোখ যায়, গিজগিজ করছে ফরাসী সৈন্য। এমন সময় ভিড় ঠেলে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল একজন। পোশাক দেখে বুঝলাম লেফটেন্যান্ট। দু'এক মুহূর্ত বাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন দেখল। তারপর ইশারা করতেই হুড়মুড় করে একদল সৈন্য ঢুকে পড়ল বাড়িতে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল বাবা। সামনেই পড়ল লেফটেন্যান্ট।

'তাড়াতাড়ি বাড়িটা খালি করে দিন,' হুকুম দিল লেফটেন্যান্ট, 'জার্মানরা এসে পড়ল বলে।'

'কিন্তু...,'

বাবা কিছু বলার আগেই থামিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট, 'কোন কিন্তু নয়, এক্ষুণি খালি করে দিন বাড়ি। ওদের ঠেকানোর জন্যে বাড়িটা চমৎকার। যান, যান, শিগগির যান, দেরি করবেন না।' বাবাকে এক রকম ঠেলেই পাঠিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

বাবা-মা আর আমাদের পারিবারিক বন্ধু লাসেল ডেলডঙ্ক তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল সেলারে। আমি একছুটে দৌড় দিলাম দোতলায়। পেছন থেকে মা-র চিৎকার শুনলাম, 'মার্থা, কিছু খাবার নিয়ে শিগগির নেমে আয়।'

'আসছি, মা,' চিৎকার করে উত্তর দিলাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেলারে যাচ্ছি না আমি। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের যুদ্ধ দেখার সুযোগ পেয়েছি। মরে গেলেও এ সুযোগ ছাড়ছি না। দোতলায় জানালার পাশে ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম। দৃষ্টি দিগন্তে।

নিচের তলায় ফরাসী সৈন্যরা ততক্ষণে বাড়িতে ভারি আসবাব-পত্র যা ছিল সব দরজা জানালার সামনে এনে ফেলেছে। ব্যারিকেড হচ্ছে ওগুলো। লেফটেন্যান্ট হুকুম দিতেই ওগুলোর পেছনে রাইফেল নিয়ে রেডি হয়ে গেল ওরা। তীব্র উত্তেজনার একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরে, সত্যিকারের যুদ্ধ দেখব এবার!

একটু পরেই দেখা গেল জার্মান সৈন্যদের। বহুদূরে, ধূসর রঙের একটা দেয়াল যেন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। চুপচাপ অপেক্ষা করল লেফটেন্যান্ট। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই গর্জে উঠল, 'ফায়ার!'

প্রচণ্ড শব্দে তালা লেগে গেল কানে। জানা থাকা সত্ত্বেও কেঁপে উঠলাম।

থেমে গেল ধূসর দেয়াল। নিচু হলো, তারপর চকচক করে উঠল কালো কালো নল। দিগন্ত প্লাবিত করে ভেসে এল নিউমেটিক হ্যামারের খটাখট শব্দ। তারপরই নরক ভেঙে পড়ল একসাথে। বাড়ির ছাল তুলে দিয়ে, গাছের পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে বৃষ্টির মত শুরু হলো গুলি। হঠাৎ চুলে হ্যাঁচকা টান পড়তেই শুয়ে পড়লাম মেঝেতে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, দেয়ালে দুটো গর্ত। এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। মাথা গুঁজে পড়ে থাকলাম ওভাবেই। ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে

www.shopnil.com

www.shopnil.com

শরীরে। হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন ডাকছে আমাকে। একটু মাথা তুলতেই দেখি, সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মত উঠে আসছে মা। আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'শিগগির সেলারে আয়।'

ব্যাপার-স্যাপার দেখে যুদ্ধ দেখার শখ ততক্ষণে পুরোপুরি মিটে গেছে আমার। এখন নিরাপদ জায়গায় যেতে পারলে বাঁচি। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাড়াতাড়ি নিচে নেমেই দেখি সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে আছে একজন ফরাসী সৈনিক। বুকের একপাশ রক্তে ভিজে গেছে। আমার পায়ের শব্দে অতি কষ্টে চোখ মেলল, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'পানি।'

যুদ্ধের সত্যিকারের চেহারা দেখে ভয়ে থরথর করে পা কাঁপছে আমার। দেখেই বুঝেছি, সময় শেষ হয়ে এসেছে ওর। ভাল করে শুইয়ে দিলাম ওকে। পানি দিলাম না। এ সময় পানি খেলে ওর যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না। ওকে ওভাবে রেখেই নেমে গেলাম সেলারে।

ঘণ্টাখানেক পরে গুলির আওয়াজ কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাইরে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আস্তে করে দরজা খুললাম সেলারের। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেই একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলাম এক জার্মান অফিসারের। সাথে সাথে লাফ দিল কলজেটা, একেবারে গলার কাছে এসে ধুকপুক শুরু করল। এগিয়ে এল অফিসারটা। আমার দিকে কিছুক্ষণ কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

ততক্ষণে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে আমার, তার মধ্যেই কোনরকমে বললাম, 'কাদ্‌···কাদের কথা বলছেন, বাব্‌···বাড়িতে আমরা ছাড়া তো কেউ নেই।'

'শাট আপ,' গর্জে উঠল অফিসারটা, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা শার্প শূটারের আড্ডাখানা। কেউ নেই তো দরজা জানালার সামনে এসব ব্যারিকেড কেন? কোথায় ওরা?'

'ওগুলো তো ফরাসী সৈন্যরা এনেছে। আমরা সবাই সেলারে ছিলাম।'

'স্টপ! অল বোগাস। মিথ্যে বলার আর জায়গা পাও না!' সৈনিকদের দিকে ঘুরে হুকুম দিল, 'সেলার থেকে সবক'টা বাস্টার্ডকে ধরে আনো। হারামজাদাদের পুড়িয়ে মারব আজ।'

হুকুম পাবার সাথে সাথে পাঁচ-সাতজন ছুটল সেলারে। একটু পরেই বাবা-মা আর লাসেলকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে এল।

'আর কেউ নেই?' জিজ্ঞেস করল অফিসারটা।

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে, এই বুড়োটাই আসল বদমায়েশ। সোজা করছি ওটাকে। শার্প-শূটার হবার শখ মিটিয়ে দিচ্ছি জন্মের মত।'

বাবাকে নির্বিকারভাবে পাইপ টানতে দেখে চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল অফিসারটার। গর্জে উঠল, 'পাইপটা নিয়ে নাও শয়তানটার মুখ থেকে।'

সাথে সাথে সবচেয়ে কাছের সৈনিকটা এক ঝটকায় কেড়ে নিল পাইপ। বুটের তলায় ছাইটুকু ঝেড়ে নিঃশব্দে পকেটে পুরে ফেলল।

এর মধ্যে বাকি ঘরগুলোতে তল্লাশি শেষ করে ফেলেছে অন্যরা।

'ন্যা, স্যার, কেউ নেই,' রিপোর্ট করল একজন।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল এক কর্পোরাল। হাতে দুপুরের জন্যে রান্না করা পরিজ। কাছে এসে বলল, 'অনেক খাবার আছে, স্যার, রান্নাঘরে।'

'আগে এই বদমায়েশগুলোকে দিয়ে টেস্ট করিয়ে নাও, খাবারে বিষ দেয়া

আছে কিনা কে জানে!'

কর্পোরাল একটা চামচে করে খানিকটা পরিজ নিয়ে মার মুখের সামনে ধরে হুকুম দিল, 'খাও।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল মা। ঝট করে কোমর থেকে পিস্তল বের করল কর্পোরাল। মায়ের দিকে পিস্তল তাক করে বলল, 'খা।'

খাবারটা মুখে দিল মা। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ওরা। মায়ের কিছুই হলো না দেখে বুভুক্ষুর মত একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। যা ছিল দু'মিনিটেই খেয়ে সাফা করে ফেলল সব।

মুখভর্তি স্যান্ডউইচ নিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্পোরাল, 'এদের কি ব্যবস্থা করব?'

তৃপ্তির সাথে স্যান্ডউইচের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে অফিসার বলল, 'বুড়োটাকে রোস্ট করো, বাকিগুলোকে ভাগিয়ে দাও।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কর্পোরাল।

হুকুম দিতেই তিন-চারজন সৈনিক ধাক্কাতে ধাক্কাতে সেলারের দিকে নিয়ে চলল বাবাকে। বুকফাটা চিৎকার করে উঠল মা। ছুটে বাবার দিকে যাবার চেষ্টা করতেই মা-র বুকের সামনে বেয়োনেট উঁচু করে ধরল একজন। মা'র পা-দুটো যেন সাথে সাথে পেরেক দিয়ে মাটিতে গেঁথে দিল কেউ। অসহায়ভাবে দেখলাম, বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সেলারে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

একজন তাড়াতাড়ি ছুটল রান্নাঘরে। আধা মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল। হাতে কেরোসিনের টিন।

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠল অফিসারটা, 'এই জঞ্জালগুলোকে আগে বের করে দাও, তারপর লাগাও আগুন।'

ওরা ধাক্কা দেবার আগেই মা'কে জড়িয়ে ধরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা সবাই। নারকীয় যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। একটু পরেই অসহায় ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেলাম। বাবার গলা। সেলার থেকে ভেসে আসছে।

হাত দিয়ে শূন্যে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল মা, তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল কয়েকটা শকুন।

লাসেল আর আমার চেষ্টায় মা-র যখন জ্ঞান ফিরল, বাড়িটা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে গেছে আমার। শুধু মনে আছে, বাবা সেলারে। জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে। মাথা কুটছে দরজায়।

লাসেলের ডাকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে। মা-কে তুলে ধরেছে ও। মায়ের একটা হাত নিজের কাঁধে নিয়ে অন্য হাতটা আমার কাঁধে নিতে বলছে। ওর কথামত মা-কে নিয়ে রওনা দিলাম। গ্রামের আরেক মাথায় আমাদের পরিচিত এক ফরাসী ভদ্রলোক থাকেন। ওদিকেই রওনা হলাম। এখন, এই মুহূর্তে দরকার একটা আশ্রয়।

রাস্তা আর কাফেগুলো জার্মান সৈনিকে ভর্তি। চিৎকার, গালিগালাজ, খিস্তিতে কান পাতা দায়। মাঝে মাঝে দু'একজনের হেঁড়ে গলার অশ্লীল গান ভেসে আসছে। এক লাইন গাওয়া হতেই হৈ হৈ করে উৎসাহ দিচ্ছে বাকিরা।

যেতে যেতে চোখ পড়ল একটা মেয়ের ওপর। ছিন্নভিন্ন পোশাক, উরুতে কালচে হয়ে আসা রক্ত, সারা বুক, মুখ আর পা নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। পড়ে আছে ড্রেনের পাশে। চোখ দুটো খোলা। মৃত।

গ্রামের মাঝখানে যে মাঠে খেলাধুলা হত সেখানে জড় করা হয়েছে আহত আর নিহতদের। রাস্তায় রক্তের দাগ দেখে বুঝলাম, হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে ওদের। রক্তের গন্ধ আর আহতদের আর্তনাদে ভারি হয়ে আছে বাতাস। সারা মাঠে কাজ করছে একজন নার্স আর একজন ডাক্তার। জার্মান সৈনিকদের দিকেই ওরা খেয়াল করছে আগে। মেডিকেলের ছাত্রী আমি। এক বছর পরেই পুরোদস্তুর ডাক্তার হিসেবে বেরিয়ে আসতাম। ভাবলাম, খানিকটা সাহায্য করি। কিন্তু ওদিকে যেতেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গালি দিয়ে উঠল এক স্ট্রেচারবাহক। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। তাছাড়া মা'কেও তো দেখতে হবে আমার!

হঠাৎ কড়াৎ করে গর্জে উঠল রাইফেল। ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। ঘুরতেই দেখি, এক জার্মান সৈনিক। কাফে থেকে বেরিয়ে টলমল পায়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির সাথে তীব্র ভাবে জ্বলে উঠল আমার ডান কাঁধের কাছটায়। চিৎকার করে বসে পড়লাম মাটিতে। আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল জায়গাটা। লাসেল তাড়াতাড়ি জামার হাতা ছিঁড়ে ফেলল। দেখা গেল, তেমন কিছু নয়, সামান্য খানিকটা মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক হলে যে কি হত ভেবে শিউরে উঠলাম। লাসেল তাড়াতাড়ি চেপে ধরল জায়গাটা।

আমার আর্তনাদেই বোধহয় কিছুটা ঘোর কাটল সৈনিকটার। গুলি বন্ধ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অশ্লীল একটা গান গাইতে গাইতে রওনা দিল একদিকে।

লাসেলের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। কোনরকমে রওনা দিলাম আবার। একসময় দেখি পৌঁছে গেছি বাবার বন্ধু মঁসিয়ে হুটের বাড়িতে।

ছোট্ট একতলা বাড়ি, সামনে বাগান। বাগানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। সদর দরজায় টোকা দিল লাসেল। ভেতরে পায়ের আওয়াজ পেলাম। তারপরই খুলে গেল দরজা। বিদ্যুতের মত একটা প্রচণ্ড শিহরণ বয়ে গেল শরীরের ভেতর দিয়ে। বাবা। হাসছে। হতভম্বের মত কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না, মা'কে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে সংবিৎ ফিরল। তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরলাম বাবাকে। আমাদের চোখের জলে ভিজে গেল বাবার শার্ট।

'ওরা যখন সেলারে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল, তখন তো ধরেই নিলাম সব শেষ,' সবাই বসতেই শুরু করল বাবা, জীবনে শেষবারের মত ঈশ্বরের নাম নেয়া শুরু করলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, সেলারের পেছনে ছোট্ট জানালাটার কথা। বাইরে মাটির সাথে লাগানো প্রায়। সাথে সাথে ছুটলাম। দেখি, বেশ উঁচুতে জানালাটা। প্যাকিং বাক্সগুলো জড় করে উঠলাম ওখানে, কিন্তু মোটা মোটা গরাদ দেখে বাঁচার আশা ছেড়েই দিলাম। আস্তে করে নেমে এলাম মেঝেতে। ঘরটা তখন চুলোর মত গরম হয়ে গেছে। মেঝের মধ্যে বসে পড়লাম। হঠাৎ চোখ পড়ল হাতুড়িটার ওপর। সেদিন কি কাজে যেন নিয়ে গিয়েছিলাম, আর আনা হয়নি। লাফিয়ে উঠলাম। তারপর সেই হাতুড়ি দিয়ে বহু কষ্টে গরাদগুলো ভেঙে কোন রকমে ওই ছোট্ট ফোকর দিয়ে বেরোলাম। বাড়ির পেছন দিক ওটা। আগুন তখনও ভালমত ধরেনি ওদিকে। জার্মান শয়তানগুলোও নেই। চারপাশে দেখে নিয়ে খিচে দৌড় দিলাম। তারপর এ-গলি ও-গলি, এর মাচা ওর পুকুর ঘুরে এখানে পৌঁছলাম। তোদের আশা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

আরও জোরে জড়িয়ে ধরলাম বাবাকে। ছেড়ে দিলেই আবার যদি হারিয়ে যায়!

ঘণ্টা দুয়েক যে কিভাবে কেটে গেল টেরই পেলাম না। একটু পরেই ডাক পড়ল খাবার জন্যে।

টেবিলে বসেছি সবাই, অধৈর্য ধাক্কা শুরু হলো দরজায়। মঁসিয়ে হুট উঠে গেলেন। দরজা খুলতেই হাত-পা জমে গেল সবার। জার্মান সৈন্য। হুড়মুড় করে

ঢুকে পড়ল বাড়িতে। দুর-দুর করে তাড়িয়ে বের করে দিল সবাইকে। এতক্ষণে জানলাম আরও কয়েকটা পরিবার ছিল এ-বাড়িতে।

একটা বাচ্চা ছেলে, নিষ্পাপ চেহারা। কিছুই বোঝেনি, কি হচ্ছে। ছুটোছুটি শুরু করল। ছুটতে ছুটতে এক জার্মান সৈনিকের কাছে পৌঁছোতেই বেয়োনেটে দিয়ে গেঁথে ফেলল বাচ্চাটাকে। বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল ওর মা। উন্মাদের মত ছুটে গেল সৈনিকটার দিকে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বেয়োনেট বের করে নিল সৈনিকটা। বাচ্চার মৃতদেহ তুলে ছুঁড়ে দিল মায়ের দিকে। পড়ে গেল মা। আর উঠল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সাথে সাথে।

আশেপাশের বাড়ি থেকে আরও লোকজন নিয়ে এসে রাস্তায় জড় করল ওরা। তারপর আলাদা করে ফেলল পুরুষদের। লেফটেন্যান্টের হুকুম পেতেই ছুটে গেল কয়েকজন। পুরুষদের লাইনটা কাভার করে ফেলল। বেয়োনেট উঁচিয়ে ধরল লাইনের দিকে। চিৎকার করে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'ফরোয়ার্ড মার্চ।'

বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে এগোতে লাগল লাইনটা। কিছুদূর গিয়ে একজন আর পারল না। ছুটে আসতে চাইল তার স্ত্রীর কাছে। কড়াৎ করে গর্জে উঠল রাইফেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো শরীরটা। ধড়াস করে পড়ল মাটিতে। দু'একবার খিঁচুনি দিয়ে নিঃসাড় হয়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে থাকলাম বাবার দিকে। কোথায় যে নিয়ে গেল, কিছু জানি না। হয়তো বধ্যভূমিতে। রাস্তার বাঁকে লাইনটা অদৃশ্য হতেই নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল মা।

কিছুক্ষণ পরেই আবার আমাদের নিয়ে গিয়ে ঢোকাল মঁসিয়ে হুটের বাড়িতে। সবাইকে সেলারে নামিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিল দরজায়।

সেলারে ঢোকার পরই খেয়াল হলো, লাসেল নেই। আঁতিপাতি করে খুঁজলাম চারপাশে। নেই। তার মানে এক ফাঁকে কেটে পড়েছে ও। কিন্তু গেলটা কোথায়?

তিরিশ জন আমরা, মেয়ে আর বাচ্চা মিলে। তিনদিন ধরে আটকে আছি সেলারে। মনে হচ্ছে, তিন বছর ধরে আছি এখানে। তিনদিন পর সামান্য খাবার ও পানি পাওয়া গেল। লজ্জা-শরম ভুলতে হয়েছে প্রথম দিনেই। ঘরের কোণটাকে বানানো হয়েছে ল্যাট্রিন। সবার সামনেই সবাইকে যেতে হচ্ছে ওখানে। উপায় নেই। অসহ্য গন্ধ, নরকও বুঝি এর চেয়ে ভাল।

দু'সপ্তাহ পরে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা করে শ্বাস নিলাম। বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল বুক। বাতাস এত লোভনীয়! পৃথিবী এত সুন্দর! কতদিন ছিলাম সেলারে? দু'সপ্তা, নাকি দু'যুগ? জানি না।

'প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে যেতে পারো,' চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

সবাই চলে যেতেই একা হয়ে গেলাম আমরা। কোথায় যাব এখন?

'চল, মার্থা,' মা বলল, 'তোর বাবার আরেক বন্ধুর বাড়ি আছে ওদিকে, ওখানেই উঠি আপাতত।'

খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে মা। আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে। শেষ পর্যন্ত পৌঁছোলাম সে বাড়িতে।

বিকেল। বিষণ্ণ মনে বসে আছি বাইরে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে কেউ। পায়ের শব্দটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। ভাল করে লক্ষ করতেই ছলকে উঠল রক্ত। বাবা! ছুটে গেলাম, ঝাঁপিয়ে পড়লাম বুকে। বাবা একেবারে ছোট্ট মেয়ের মত কোলে তুলে নিল আমাকে।

www.shopnil.com

www.shopnil.com

দুই

একেবারে বদলে গেছে গ্রামটা। সারাক্ষণ সৈন্য, কামান, লরি আর অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজে কান পাতা দায়। গ্রামটা ফ্রন্ট লাইনের ঠিক পেছনে বলে এখানেই আহত সৈনিকের চিকিৎসা আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দিকে তো কোন হাসপাতালই ছিল না এখানে। পরে শুনলাম, অবস্থা দেখে স্থানীয় চার্চের তিনজন নান বড় একটা বাড়ি নিয়ে অস্থায়ী হাসপাতাল খুলেছে একটা। এখানে সবারই চিকিৎসা করা হচ্ছে। পরিচালনা করছেন মাদাম সুপিরিয়র নিজেই।

দিন পনেরো ধরে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে যাবার অবস্থা একেবারে। কোন কাজ নেই। বসে বসে শুধু রাস্তায় লোকজনের যাওয়া-আসা দেখা আর গল্পগুজব করা। শেষে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম, যা-ই হোক না কেন, হাসপাতালে কাজ নেব।

পরদিন সকালেই গেলাম হাসপাতালে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। সামনে পড়ল এক আরদালি। জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল মাদাম সুপিরিয়রের রুমটা।

নক্ করলাম দরজায়। 'কাম ইন,' মিষ্টি গলা ভেসে এল ভেতর থেকে। ঢুকলাম ভেতরে। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন মাদাম সুপিরিয়র। চমৎকার চেহারা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

'আমি মেডিকেল ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি, এখানে কাজ করতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলেন না মাদাম সুপিরিয়র। তারপরই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে এলেন চেয়ার থেকে। নিজের মেয়ের মত করে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। প্রসন্ন মিষ্টি গলায় বললেন, 'ঈশ্বরই তোমাকে পাঠিয়েছেন, মা, এখনই কাজে লেগে যাও। চলো, সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।' হাত ধরে নিয়ে চললেন মাদাম।

ওয়ার্ডে ঢুকতেই বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। মেডিকেলে পড়লেও এমন দৃশ্য দেখিনি কোনদিন। বিছানা, সোফা, মেঝে, করিডর ভর্তি আহত সৈনিক। কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও চোখ নেই, কারও নিতম্ব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। খুলি ফেটে গেছে এমন অসংখ্য আহত সৈনিক পড়ে আছে এদিক-ওদিক। আয়োডোফর্ম আর গ্যাংগ্রিনের উৎকট গন্ধে বমি ঠেলে এল। এর মধ্যে চিকিৎসা করব কি, মনে হলো নিজেরই চিকিৎসা দরকার।

একটু পরে সুস্থির হলাম খানিকটা। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার নার্স ক'জন?'

'ডাক্তার একজন, আরদালি দু'জন,' জবাব দিলেন মাদাম।

'বলেন কি?' আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে এল, 'এদের চিকিৎসা হয় কি করে?'

'যেটুকু পারি, সেটুকুই।'

নেমে পড়লাম কাজে। দেখলাম, আহত জার্মানদের দিকেই সবার নজরটা বেশি। কারণটাও জানলাম একটু পরেই। জার্মানরাই সবকিছু সাপ্লাই দিচ্ছে, ওষুধপত্র, ব্যান্ডেজ, যা যা লাগে সব। পরিমাণেও প্রচুর।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্রাম হারাম হয়ে গেল আমার। এত আহত সৈনিক আসছে যে দিনরাতের চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় কাজ করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়,

সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই। পরক্ষণেই যখন আহতদের দিকে তাকাই, সাথে সাথে দূর করে দিই চিন্তাটা। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম, রোগীরা তো বটেই, ডাক্তার আর নার্সরাও খুশি আমার কাজে।

হাসপাতালের কাজ ভাল চললেও অন্যদিকে খারাপ হয়ে উঠেছে অবস্থা। জার্মানরা প্রত্যেক বেলজিয়ানকে স্পাই বলে সন্দেহ করা শুরু করেছে। রাস্তায় বেরোলেই হলো। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। আর সামান্য পরিমাণ সন্দেহ হলে তো কথাই নেই, জেরার পর জেরা। আর উত্তর দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যে কি কঠিন, যারা তাদের কবলে পড়েছে, তারাই জানে। সবকিছুতেই ব্যাটাদের সন্দেহ। কারও বাড়ির চিমনি দিয়ে ঘন ধোঁয়া বেরোল তো খবর হয়ে গেল তার। অভিযোগ, স্মোক সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল সে।

একদিন চার্চের বুড়ো যাজককে পৈশাচিকভাবে হত্যা করল ওরা। প্রথমে নিজের হাতে কবর খুঁড়িয়েছে তাকে দিয়ে, তারপর বেয়োনেট দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে মাটিচাপা দিয়েছে। অভিযোগ, রাতে আলোর সঙ্কেত দেখা গেছে তার জানালা দিয়ে।

আরেকদিন কারখানার দু'জন শ্রমিককে হত্যা করল জার্মানরা। শ্রমিকদের অপরাধ, তারা জার্মান সৈনিকের ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে গিয়েছিল। তার মানে, পানিতে নিশ্চয়ই বিষ মেশানো ছিল। আসলে ছিল কি ছিল না, সেটা প্রমাণ করার জন্যে অত সময় কই! তার চেয়ে অনেক সোজা শাস্তি দেয়া। শ্রমিক দু'জনের মৃতদেহদুটো রাস্তার ধারে ফেলে রাখল। শিক্ষা হোক বেলজিয়ানদের।

এসব দেখে সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। একে তো মেয়ে, কখন কোন ছুতোয় আটকে দেয়, কে জানে!

একদিন দোতলার বারান্দা দিয়ে যাচ্ছি, সিঁড়িতে বুটের শব্দে থমকে দাঁড়ালাম। একটু পরেই দেখা গেল সবুজ হেলমেট। একজন জার্মান অফিসার। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক দেখল একবার, তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাদাম সুপিরিয়র কোথায়, ফ্রাউলিন?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'ভেতরে আছেন, ডেকে দেব?'

'হ্যাঁ।'

আমি মাদামের রুমের দিকে দু'পা কেবল এগিয়েছি, পেছন থেকে ডাক পড়ল, 'শোনো।'

ঘুরে দাঁড়ালাম। অফিসারটা আমার চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'কাল রাতে এই হাসপাতাল থেকে আলোর সঙ্কেত পাঠাতে দেখা গেছে।'

মুহূর্তে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। অফিসারটার চোখে পড়ল কিনা কে জানে! মনে হলো, এক নিমেষে শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে জিবটা। ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, 'তা কি করে হয়? এখান থেকে আলোর সঙ্কেত দেবার মত কেউ নেই। হয়তো আলো হাতে নিয়ে এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় বাইরে থেকে দেখা গেছে সেটা।'

আমার চোখে কঠোর চোখজোড়া রেখে অফিসারটা বলল, 'মাদাম সুপিরিয়রকে ডাকো।'

বুকের মধ্যে কাঁপছে থরথর করে। সেই অবস্থায় ছুটলাম মাদামের রুমে। তাঁকে সাথে নিয়ে বাইরে এলাম। মাদাম মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

পাত্তাই দিল না অফিসার। কঠিন গলায় বলল, 'তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনি এবং নান দু'জন কোর্টে আসবেন। আশা করি, আদেশ অমান্য করার শাস্তি আপনার

জানা আছে?' আর তুমি,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানেই থাকবে। শুনেছি, জার্মান ভাষায় ভালই দখল আছে তোমার। আর ডাক্তারিও নাকি ভালই করছ। রিপোর্ট সেরকমই দেখলাম।' চলে গেল অফিসারটা।

ঘণ্টা দুয়েক পরে চলে গেলেন মাদাম সুপিরিয়র। সাথে নান দু'জন। চোখভরা জল নিয়ে মাদাম কোন রকমে শুধু বললেন, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।' ওঁরা চোখের আড়াল হতেই টপ করে ঝরে পড়ল আমার প্রথম অশ্রুবিন্দু।

সারা ওয়েস্ট রুজবেকে আমরা বারোজন মাত্র মেয়ে। এক বাড়িতেই থাকি। থাকি, মানে থাকতে হয়। নিরাপত্তার কারণেই। মা-ও আছে আমার সাথে। আমাকে ছাড়া বাকি সবাইকে জার্মান অফিসারদের জামা-কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, এসব করতে হচ্ছে। একে তো নার্স, তার ওপর জার্মান ভাষাটা ভালই জানি। এ কারণেই সম্ভবত একটু বেশি ভাল ব্যবহার পাচ্ছি আমি জার্মানদের কাছ থেকে। সময়ে অসময়ে দোভাষীর দরকার হলেই ডাক পড়ে আমার।

মাদাম সুপিরিয়র আর নান দু'জন চলে যাবার পর থেকে কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে যে বলতে গেলে খাওয়ার সময়ই পাই না। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত হুকুম হলো, আমাকে ছাড়া সব মেয়েকেই রুজবেক ছাড়তে হবে। খবরটা শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। চিন্তাই করতে পারলাম না, কি করব। একবার ভাবলাম, আমিও চুপি চুপি চলে যাই ওদের সাথে। সাথে সাথেই অবশ্য বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। এর পরই মনে মনে একটা মতলব আঁটলাম। জায়গামত তেল দিতে হবে। ছুটলাম কয়েকজন অফিসারের কাছে। জানতাম, মেয়েরা চলে গেলে সবচেয়ে অসুবিধে হবে তাদেরই। অন্য কিছু নয়, জামা-কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না, এগুলো কে করে দেবে?

মেয়েদের রাখার জন্যে বলতে গেলে আগ বাড়িয়েই সুপারিশ করল অফিসারগুলো। সুপারিশপত্র নিয়ে ছুটলাম হেডকোয়ার্টারে। ওখানে কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আদায় করলাম অনুমতি। কিন্তু কপাল খারাপ। ওয়েস্ট রুজবেকে পৌঁছানোর আগেই সন্ধ্যা নামল। এসে দেখি, সবাই চলে গেছে। সারা গ্রামে একমাত্র মেয়ে আমি। কথাটা ভাবতেই ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে।

দেখলাম, বাড়ির সামনে দু'জন জার্মান গার্ড। আমাকে দেখে জিভ দিয়ে আস্তে করে ঠোঁট চাটল দু'জনই। ওদের চোখের দিকে তাকিয়েই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। মেয়ে আমি, ওদের চোখের ওই ভাষা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি আমার।

গার্ড দু'জনের একজন তালপাতার সেপাই। তার সাহস বোধহয় একটু বেশি। আমি বাড়িতে ঢোকার একটু পরেই ঘরে এসে হাজির। হাতে গ্লাস আর অর্ধেক ভর্তি মদের বোতল। কাছে এসে ঢুলুঢুলু চোখে বলল, 'এসো, ফ্রাউলিন, গলাটা একটু ভেজানো যাক।' দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে একটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। এর মধ্যে কখন গুটি গুটি পায়ে অন্য গার্ডটাও ঢুকেছে ভেতরে। এটা আবার বেঁটে বাঁটুল।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোনরকমে বললাম, 'ধন্যবাদ, তোমরাই খাও। আমি খাব না।' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলাম। কাঁপেনি একটুও।

'ঠিক আছে। না খেলে কি আর করা!' কথা শেষ করার আগেই আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়া গ্লাসটা টেনে নিল তালপাতা। ঢকঢক্ করে দু'গ্লাস গলায় ঢেলে বেঁটে বাঁটুলের দিকে এগিয়ে দিল বোতলটা।

আধ ঘণ্টাখানেক চালাল দু'জন এভাবে। এর মধ্যে দু'বোতল শেষ করে তিন নম্বর বোতলের ছিপি খোলার চেষ্টা করছে। হাত এত কাঁপছে যে বিশেষ সুবিধা

করতে পারছে না। একটু পরেই জড়ানো গলায় শুরু হলো ঝগড়া। আস্তে আস্তে চড়তে থাকল গলা। এক সময় বুঝলাম, ঝগড়াটা কি নিয়ে। আর বুঝতেই হিম হয়ে গেল আমার শরীর। কে আগে, এই নিয়ে বিতর্ক।

এত বিপদের মধ্যেও সাহস হারাইনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, দুই মাতালের ঝগড়ার ফাঁকে তো কেটে পড়া যায়!

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে পৌঁছাতেই চোখে পড়ে গেলাম তালপাতার। লাফিয়ে এল আমার দিকে। সরে যাবারও সময় পেলাম না। হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল সে বিছানার কাছে। হাঁটুর ওপর চেপে ধরে চুমো খাবার জন্যে হুটোপুটি শুরু করে দিল। দুঃখে, আতঙ্কে চোখে জল বেরিয়ে এল আমার। বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ল সেই মেয়েটার কথা, বাচ্চাদের জন্যে যে দুধ চেয়েছিল। বুঝলাম, বাঘের মুখে পড়লে শিকারের কেমন লাগে! শরীর মুচড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ছাড়ানোর জন্যে।

এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল বেঁটে বাঁটুল। হঠাৎ কি হলো কে জানে, খেপে উঠে চিৎকার শুরু করল সে, 'এই শালা! ছাড়, ছাড় ওকে!'

ডুবন্ত লোক যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, আমার তখন সেই অবস্থা। বেঁটে বাঁটুলকেই মনে হলো পরম আত্মীয়। ব্যাকুল গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে!'

লাফিয়ে এল বেঁটে বাঁটুল। চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই 'উহ্' করে চিৎকার করে উঠল তালপাতা। আরেক টানেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। মুক্তি পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠলাম। উঠে দাঁড়ালাম বিছানা ছেড়ে। পোশাক-টোশাক ঠিক করব, হঠাৎ বুকের সাথে চেপে ধরল বেঁটে বাঁটুল। মাথার মধ্যে বোমা ফাটল। এক ঝাঁকুনিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যাবার আগেই ঝাঁপিয়ে এল আবার। জাপটে ধরল বুকের মধ্যে। অপমানে, লজ্জায়, দুঃখে, আতঙ্কে চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ ছিটকে পড়ল ও। এর মধ্যে সামলে নিয়েছে তালপাতা। মেঝে থেকে উঠেই প্রচণ্ড ঘুসি মেরেছে বেঁটে বাঁটুলের মুখে। ব্যস শুরু হয়ে গেল লড়াই। দুই মাতালের অশ্রাব্য গালিগালাজ আর মারপিটে নরক হয়ে উঠল ঘরটা।

তালপাতা বোধহয় গিলেছিল বেশি। দেখা গেল ওই বেশি মার খাচ্ছে। এক সময় একটু ফাঁক পেয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ধুস্ শালা, মারপিট করে লাভ কি! দু'জনেই তো মৌজ করতে পারি। শুধু শুধু শক্তি ক্ষয় করি কেন?'

অন্যজন ঘাড় বাঁকিয়ে এমন ভাবে তাকাল যেন গভীর কিছু চিন্তা করছে। হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল, 'তাই তো, শালা, কথাটা আগে মনে আসেনি কেন? দোস্ত, তোর মাথায় সত্যি সত্যি ব্রেন আছে!'

'চল, দোস্ত, আরেকটু মাল টানি। নেশাটা একটু জমুক। তারপর সারারাত…।' কথাটা শেষ না করেই আমার দিকে অশ্লীলভাবে চোখ টিপে সঙ্গীর দিকে তাকাল তালপাতা। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করলো বেঁটে বাঁটুল।

দু'জনে তৃতীয় বোতলটা নিয়ে বসল। এক চুমুক খায়, আর আমার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল হাসি হাসে। আধাআধি শেষ করতেই যেন নেশা ধরে গেল দু'জনের।

হঠাৎ চোখ পড়ল ঘড়ির দিকে। মাত্র সাড়ে দশটা। তার মানে, সারা রাতই পড়ে আছে।

জীবনে এত অসহায় অবস্থায় পড়িনি কখনও। মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। বাঁচার জন্যে যে কত আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় এল, তার ইয়ত্তা নেই। একবার মনে হলো, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি বিছানায়। তাহলে

www.shoponil.com

হয়তো ওরা কিছু না-ও করতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তে এমনই হাস্যকর মনে হলো যে সাথে সাথে দূর করে দিলাম চিন্তাটা। হঠাৎ করে খিচে দৌড় দিয়ে পালাব নাকি? দরজার দিকে আড়চোখে তাকালাম একবার। সম্ভব নয়। ঠিক দরজার সামনেই জমিয়ে বসেছে দু'জন।

অসম্ভব সব পরিকল্পনা মাথায় আসছে আর একটা একটা করে বাতিল করে দিচ্ছি। এমন সময় টলতে টলতে এগিয়ে এল তালপাতা। মুহূর্তে জমে গেল শরীর। মনের গভীরে কে যেন বলে উঠল, 'সব শেষ।' তাহলে এ-ই ছিল কপালে?

ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছি তালপাতার দিকে। দেখছি তার কুটিল হাসিতে ভরা মুখ। হিংস্র শ্বাপদের মত এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল তালপাতা। গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরোল না। তাছাড়া চিৎকার করেই বা কি লাভ! কে আসবে বাঁচাতে?

তালপাতা এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে ফেলল আমাকে। বুকের সাথে চেপে ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল খাটের দিকে।

প্রাণপণে বাধা দিলাম। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। কিছু হলো না। মাতাল হলেও এত শক্তি ওর গায়ে যে কিছুই করতে পারলাম না। বিছানায় ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও আমার ওপর। ব্যস্ত হাতে কাপড় খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

জানি না, কেন হঠাৎ মনে এল, হয়তো ঈশ্বরই জানিয়ে দিলেন কথাটা। হাঁপাতে হাঁপাতে তালপাতাকে বললাম, 'ওকে তাহলে ঘর থেকে চলে যেতে বলো।'

তালপাতা বুঝল, কেল্লা ফতে। আমি রাজি। লাফিয়ে উঠল আমার ওপর থেকে। বেঁটে বাঁটুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, তুই বাইরে যা। এসব বড়দের ব্যাপার, ছোটদের থাকতে নেই। যা, বাইরে যা।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল বেঁটে বাঁটুল। বলল, 'ওসব ধানাইপানাই ছাড়ো বাওয়া। যা করবে আমার সামনে করো। আমি নড়ছি না এখান থেকে।'

তালপাতা বুঝল, ব্যাপার বেশি সুবিধের নয়। নরম করল গলা। বোঝানো শুরু করল বেঁটে বাঁটুলকে, 'আরে ভাই, যা-না একটু বাইরে। একটু পরেই তো তোর পালা আসবে। তখন তুই মনের সুখে যা করার করিস্। আমি তখন তোর থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকব।'

টলানো গেল না বেঁটে বাঁটুলকে। তার এক কথা, 'যা করবে, আমার সামনে করো। দরজা বন্ধ করে আমার আড়ালে মজা করবে, সেটি হচ্ছে না, চাঁদু।'

ওদের ঝগড়া দেখছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো, পালাবার এই শেষ সুযোগ। দ্রুত চারপাশে তাকালাম। দেখি, খাটের পাশে একটা জানালা। কাচের শার্সি দিয়ে বন্ধ করা। কোনকিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জানালায়। ঝনঝন করে হাজার টুকরো হয়ে গেল কাচটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বাগানে। কোনরকমে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠেই ছুটলাম। কোথাও কেটেকুটে গেল কিনা তা দেখারও সময় নেই। একটাই লক্ষ্য আমার, পালাতে হবে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ চোখে পড়ল আলো। বেশ কিছুটা সামনে। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল তাতেই। বাড়িয়ে দিলাম ছোটার গতি। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি ধরে ফেলে তালপাতা।

কাছে আসতেই দেখি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ওটা। সোজা ঢুকে পড়লাম। আমাকে ওভাবে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে চমকে গেল সবাই। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বেঁচে গেছি, এই অনুভূতিটা ফিরে আসতেই শরীরের ভার বইতে অস্বীকার করে বসল পা-দুটো। পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল একজন। বসিয়ে দিল

চেয়ারে। পুরো দশ মিনিট লাগল ঠাণ্ডা হতে। তারপর খুলে বললাম সব। শুনে মাথা নাড়ল ওরা, 'জার্মানরা ওরকমই। ভাগ্যটা খুব ভাল আপনার। বেঁচে ফিরতে পেরেছেন। আজকে রাতটা এখানেই থেকে যান। এই ইজিচেয়ারটা ছাড়া কিন্তু আর কিছু নেই।'

আমি তখন ইজিচেয়ার কেন, শুধু মেঝে হলেও থেকে যেতে রাজি। বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোন অসুবিধা হবে না আমার।' শুয়ে পড়লাম চেয়ারে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মুখ-টুখ ধুয়ে এসে দেখি নাশতা আর এক মগ কফি নিয়ে এসেছে অপারেটর। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন। নাশতা শেষ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

হাসপাতালে পৌঁছে প্রথমেই গেলাম সার্জনের কাছে। সব শুনে সার্জন বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত, ফ্রাউলিন। আর যেন এরকম না হয়, এখনই তার ব্যবস্থা করছি। তুমি বরং আমার পাশের বাড়িটাতে থাকো। এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেই সাথে ভাল গার্ডেরও ব্যবস্থা করছি। কেউ আর বিরক্ত করবে না। তোমাকে অনুরোধ করব, যা ঘটেছে সেসব ভুলে যাবার জন্যে।'

সার্জনের পাশের বাড়িতেই উঠলাম। এক ফাঁকে মেয়েদেরকে গ্রামে রাখার হুকুমনামা জমা দিয়ে এলাম। চারদিনের দিন বিকেলে দেখি, ফিরছে সবাই। কী যে খুশি লাগল! ছুটে গেলাম সাথে সাথে। আঁতিপাতি করে খুঁজলাম মা'কে। আছে, লাইনের একেবারে শেষে। ছুটে গেলাম। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। মনে মনে যে কত কথা হয়ে গেল সে আমি জানি আর মা জানে।

সবাইকে আগের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে সোজা গেলাম সার্জনের কাছে। বললাম, 'আজ থেকে আমি আগের বাড়িতেই থাকব। সব মেয়েরা ফিরে এসেছে।'

সার্জন হাসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

খুশিমনে ফিরে এলাম। ডিউটি শেষ হতেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটলাম বাড়িতে। সোজা মায়ের কোলে।

সেই তালপাতা আর বেঁটে বাঁটুলকে দেখলাম না কোথাও।

একভাবে কাটতে লাগল দিনগুলো। এর মধ্যেই এসে চলে গেল ১৯১৪ সালের বড়দিন।

www.shopnil.com

তিন

নতুন বছরের শুরুতে মনে হলো, মিত্রবাহিনী এতদিনে হালে পানি পেয়েছে খানিকটা। জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মিত্রপক্ষের গোলা পড়তে শুরু করল ওয়েস্ট রুজবেকে। এতদিন ঢিলেঢালা ভাবে কাটানোর জন্যেই হোক, আর অন্য কোন কারণেই হোক, আহত হতে লাগল প্রচুর। অধিকাংশই জার্মান।

কমান্ড্যান্ট অফিসে আমার ডাক পড়ল একদিন। ভয় পেয়ে গেলাম। কি ঘটল আবার? সাহস করে গেলাম। যেতেই কমান্ড্যান্ট বলল, 'তোমরা আর এখানে থাকতে পারবে না, ফ্রাউলিন। মেয়েদের সবাইকে রুলার্সে যেতে হবে। ওপরওয়ালার হুকুম।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার জন্যে চিন্তা কোরো না। রুলার্সের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তোমার কথা লিখে দেব। ওখানে কাজ পেয়ে যাবে তুমি।'

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম সবাই। যাবার

www.shopnil.com

পথে মা'কে দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটলাম কমান্ড্যান্টের কাছে। আমাকে দেখে চিঠিটা বের করল কমান্ড্যান্ট। বলল, 'রুলার্স হাসপাতালের ওবার্তাজকে লিখেছি আশা করি, কাজটা পেয়ে যাবে। চিঠিটা সরাসরি ওঁর হাতেই দেবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নিচে নেমে এলাম। মা'কে সাথে নিয়ে দ্রুত পা চালালাম। সামনে অন্যদেরকে ধরতে হবে।

পড়ন্ত দুপুর। এইমাত্র পৌঁছেছি। রুলার্সে আসার সময়ই চেপে বসেছিল চিন্তাটা, এতক্ষণে সেটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উঠব কোথায়? চেনাশোনা কেউ নেই এখানে। দেখলাম, সবারই এক অবস্থা। ফুটপাথের বাসিন্দাদের মত এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম গ্র্যান্ডপ্লেসের কাছে। পা ধরে গেছে। এবারে একটু বসতে হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে ফুটপাথের ধুলোবালির মধ্যেই বসে পড়লাম। একটু পরেই দেখতে পেলাম একজন মহিলাকে। রাস্তার ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। দু'এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল, তারপর রাস্তা পার হয়ে সোজা চলে এল আমাদের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা রিফিউজী?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

'ওয়েস্ট রুজবেক।'

'থাকার কোন ব্যবস্থা নেই নিশ্চয়ই?'

'না। কি যে হবে, কে জানে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল একজন।

'শোনো, আমার বাড়িতে দু'জন থাকতে পারবে। তোমরা চাইলে আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে অন্যদের থাকার ব্যবস্থা করা যাবে।'

সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই। আমার মনে হলো, স্বয়ং ঈশ্বরই বোধহয় মহিলার রূপ ধরে নেমে এসেছেন পৃথিবীতে।

আমি আর মা গেলাম মহিলাটির বাড়িতে। আমাদের রেখে বাকিদের নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। জানাল, সবার ব্যবস্থাই হয়ে গেছে।

অনুভব করলাম, যুদ্ধ শুধু মানুষকে নৃশংসই করে না, কোন কোন সময় মহৎ-ও করে।

বড় একটা শোবার ঘরে জায়গা পেয়েছি। খুব ভাল আছি আমরা। দিন দু'য়েক পরে বাবার খোঁজ নিয়ে এল মহিলাটি। আসার আগে অবশ্য শুনেছিলাম যে বাবা এখানে। কী যে ভাল লাগল কথাটা শুনে। আনন্দে জল এসে গেল চোখে। বাবাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। দিন তিনেক পরে বাবা এল। খুব খারাপ হয়ে গেছে শরীর। দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। বাবার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরীর এত খারাপ হলো কি করে, বাবা?'

'আর বলিস নে, মা,' উত্তর দিল বাবা, 'সামান্য এক অপরাধে জেলে পুরে দিল। বেশ কয়েক দিনের জন্যে। জেলের পরিশ্রম আর খাওয়া কি আর এই বয়সে সহ্য হয়?'

চমকে উঠলাম। জানতাম না কথাটা। বললাম, 'আমাদের জানাওনি কেন?'

'জানানো সম্ভব ছিল না। আর জানলেও তো কিছু করতে পারতি না। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা বাড়ত।'

'এখন কি করছ, বাবা?'

'জেল থেকে বেরিয়েই এক ফার্মে কাজ পেয়েছি। মালিক ভদ্রলোক খুব ভাল মানুষ। থাকার জায়গাও দিয়েছেন।'

বাবার সাথে কথা বলতে বলতে কী করে যে সময় পার হয়ে গেল টেরই পাইনি। রাতের খাবার সময় হতেই চমক ভাঙল। বাব্বাহ্, এতটা সময় চলে গেছে?

ওয়েস্ট রুজবেক থেকে রুলার্স মাত্র দু'মাইল। অথচ কী আশ্চর্য পার্থক্য এখন দু'জায়গায়। দিনরাত গোলা ফাটার শব্দ নেই, কামান লরির ঘড়ঘড়ানি নেই, সৈনিকদের চিৎকার নেই। মনেই হয় না, যুদ্ধ বলে কিছু হচ্ছে কোথাও। নিশ্চিন্তে রয়েছে সবাই।

কয়েকদিন শুয়ে বসে থেকে বিরক্তি ধরে গেল। কিছু একটা কাজ করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, কিছু রোজগার করা দরকার।

পরদিন সকালে কমান্ড্যান্টের দেয়া চিঠি আর সার্টিফিকেট নিয়ে গেলাম রুলার্স মিলিটারি হাসপাতালে। খুঁজতে খুঁজতে উঠলাম দোতলায়। ওবার্তাজের রুমের সামনে। দরজার সামনে আরদালি বসে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হের ওবার্তাজ আছেন?'

'জ্বী, আছেন।'

'দেখা করব আমি।'

'জ্বী, আসুন।' সাথে নিয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে বলল, 'ভেতরে যান।'

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। টেবিলের ওপাশে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক বসে। হের ওবার্তাজ। অনেক দিন হলো যৌবনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বয়স।

আমার দিকে সস্নেহ প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন ওবার্তাজ। কোন কথা না বলে চিঠি আর সার্টিফিকেট দুটো এগিয়ে দিলাম। চিঠিটা পড়তে পড়তে হাসি ফুটল ওঁর মুখে। পড়া শেষ হলে সস্নেহে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে, মা। ঈশ্বরই তোমাকে পাঠিয়েছেন। হাসপাতালে একজন নার্সও নেই। তুমিই হবে এই হাসপাতালের প্রথম নার্স।' হঠাৎ খেয়াল হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ওবার্তাজ, 'আরে, আরে, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো, বসো। কী ভুলো মন আমার!' বসলাম। কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ওবার্তাজ বললেন, 'কয়েকটা দরকারী কাজ সেরে নিই, তারপর তোমাকে হাসপাতালটা ঘুরিয়ে দেখাব। কি বলো?'

উত্তরে হাসলাম আমি।

হাসপাতালটা দেখে বেশ ভাল লেগে গেল। সবচেয়ে ভাল লাগল সিভিলিয়ন ক্লিনিক। রুলার্সের গরীব লোকেরা সত্যি সত্যি সুচিকিৎসা পায় এখানে।

'তাহলে ওই কথাই রইল,' ফেরার সময় আবার মনে করিয়ে দিলেন ওবার্তাজ, 'সোমবার সকাল সাতটার মধ্যে চলে আসছ তুমি। টাউন কমান্ড্যান্টের কাছে আমার চিঠিটা দিলেই রাতের পাস দিয়ে দেবে তোমাকে। পাসটা দরকারী। কখন কি কাজে ডাক পড়বে তোমার, তার কি ঠিক আছে?'

হেসে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। দিনকতক যাবার পর বুঝলাম, মানুষ চট্ করে ভুল করে কেন। প্রথম দর্শনে রুলার্সকে যতই নিরুপদ্রব মনে হয়ে থাক না কেন, ব্যাপারটা বুঝতেই শান্তি উবে গেল। সারাক্ষণ আতঙ্ক, কখন স্পাই সন্দেহে ধরে নিয়ে যায় বার্লিন ভ্যাম্পায়ার বাহিনী। স্পাই ফোবিয়া পেয়ে বসেছে জার্মানদের। প্রত্যেক বেলজিয়ানকেই স্পাই বলে সন্দেহ করে। সেজন্যে সারাক্ষণ কড়া নজর তো রাখেই, অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে কারফিউ দেয়া আছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

আমাদের মত অনেক রিফিউজী মেয়ে আছে রুলার্সে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই রোজগারের জন্যে হ্যান্ডব্যাগ তৈরি করে। সুতি, পশমী, রেশমী সব ধরনের কাপড়

দিয়েই বানানো হয় ব্যাগগুলো। রোজগারও নেহাত মন্দ হয় না। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। মেয়েদের যা স্বভাব! ভাল কাপড় হাতে এলেই সাথে সাথে সেটা চোখের সামনে পোশাক হয়ে নাচানাচি করে। আর একবার মনে ধরে গেলেই হলো। সোজা চুরি করে বসবে। এবং ধরা পড়বে। বেশ কিছু মেয়ে জেল খাটছে এজন্যে।

কাপড় ছাড়াও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন জিনিস-পত্রের সিংহভাগই দিতে হয় জার্মানদের। বাকিটুকুর জন্যে শুরু হয়ে যায় কামড়াকামড়ি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। অবস্থাটা আরও খারাপ হত যদি মার্কিন রিলিফ মিশন না আসত। ওরা না এলে হয়তো দুর্ভিক্ষেই মারা পড়তাম আমরা। জার্মানরাও রিলিফ নিয়ে আসা জাহাজগুলোকে বাধা দিত না।

রিলিফ মিশনের পরিচালক ছিলেন মিস্টার হুভার্ট। তাঁর নামেই চাল চিনি আর ময়দা মাখানো ক্রিয়েলিংকে আমরা বলতাম 'হুভার সাহেবের খিচুড়ি'। আর বেকনকে বলতাম 'উইলসন'। স্বাদে-গন্ধে যাই হোক না কেন, লোকজন তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করত এগুলোর জন্যে।

সকাল সাতটা। গল্প করছি মায়ের সাথে। রান্না করছে মা। টুকটাক এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছি। নাইট ডিউটি করে এসেছি। ক্লান্ত লাগছে খুব। কিছু খেয়ে এখন শুতে পারলে বাঁচি। হঠাৎ ঠকঠক করে কে যেন টোকা দিল দরজায়।

'দেখ তো, কে এল?'

উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। সামনে দাঁড়িয়ে লাসেল। খুশিতে চিৎকার করার জন্যে কেবল মুখ খুলেছি, ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে 'হিস্স্…' করে উঠল লাসেল। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা কোথায়?'

'রান্নাঘরে।'

'চলো, ওখানেই বসি।'

ওকে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে নিজেও বসলাম ওর পাশে।

'আমি যে এখানে এসেছিলাম ঘুণাক্ষরেও সে কথা যেন কেউ না জানে,' ফিসফিস করে বলল লাসেল, 'তুমি আর তোমার মা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই জেনেই বাড়িতে ঢুকেছি আমি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জানলে কি করে?'

'জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছি।'

লাসেলের কথাবার্তার ধরন দেখে কেন যেন শিরশির করে উঠল শরীরের ভেতরে। একটু যেন শীত শীত করতে লাগল। এমন ভাবে কথা বলছে কেন ও? মা একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে গ্লাসটা লাসেলকে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলে এতদিন? আমরা তো তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

এক চুমুকে ব্র্যান্ডিটুকু শেষ করে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল লাসেল। মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'সে অনেক কথা। আরেকদিন বলা যাবে। শোনো,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ভাইদের খবর আছে।'

'ওদের…,' ব্যস্ত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমাকে থামিয়ে দিল লাসেল, 'ভাল আছে ওরা। তিনজনেরই চিঠি আছে। এই যে!' তিনটে চিঠি বের করে দিল ও। মা আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম চিঠিগুলোর ওপর।

পড়া শেষ হতেই ভিজে উঠল মায়ের চোখ। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাকাল লাসেলের দিকে। লাসেল বলল, 'আজকে আর সময় নেই, চলি।'

'সে কি!' ব্যস্ত হয়ে উঠল মা, 'এখনই যাবে কেন? খাওয়া দাওয়া করে যেও।'

'সে হয় না,' হাসিমুখে কিন্তু স্থির গলায় বলল লাসেল, 'হল্যান্ড সীমান্ত থেকে চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুধু এই চিঠি তিনটে দেয়ার জন্যে আসিনি আমি। আমাকে আরও দশ মাইল রাস্তা পেরোতে হবে। ওরা যদি কোনভাবে টের পেয়ে যায়…' হঠাৎ থেমে গেল লাসেল, 'ঠিক আছে, চলি, বেঁচে থাকলে দেখা হবে আবার।'

বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে কি মনে করে আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল, 'কোনভাবেই যেন কেউ জানতে না পারে আমি এসেছিলাম। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।'

দরজা খুলে দিলাম। সিঁড়িতে নেমে ঘুরে দাঁড়াল লাসেল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। দপ দপ করে জ্বলছে। মাথাটা ঘরের ভেতরে এনে থেমে থেমে বলল, 'মার্থা, তুমি তো বড় হয়েছ, যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও। দেশের জন্যে কিছুই কি করার নেই তোমার?'

থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। স্পাই! লাসেল স্পাই! স্পাই হতে বলছে ও আমাকেও!

দেখি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাসেল। কি বলব আমি! সীসার মত ভারি হয়ে গেছে জিভ। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই দু'জনকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়ে মা বলে উঠল, 'মার্থা কিছু করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

ঝট করে মা-র দিকে ফিরলাম। কোন ভাবান্তর নেই মায়ের। কত ভয়ঙ্কর কাজ, অথচ কি অবলীলায় সম্মতি দিল মা। এজন্যেই কি, মা, তোমার চেয়ে বড় কিছু নেই পৃথিবীতে? আস্তে করে বললাম, 'আমি রাজি।'

'বিপদের কথা ভেবে দেখো, মার্থা,' তীক্ষ্ণ অথচ নিচু স্বরে বলল লাসেল, 'মৃত্যুর আশঙ্কা প্রতি পদে।'

'জানি আমি,' শান্ত স্বরে বললাম।

'ঠিক আছে,' আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এল লাসেল, 'আমার পরিচয় জানিয়ে রাখছি তোমাকে। বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের সদস্য আমি। আমাদের সব নির্দেশ ওপর থেকে আসে। সেজন্যে আপাতত তোমাকে জানাবার মত কিছু নেই। আগামী কয়েক দিনের ভেতর, যে কোন দিন, যে কোন সময়, যে কোন লোকের হাতে নির্দেশ পাবে তুমি। যে অবস্থায়, যে লোকের হাতেই খবর পাও না কেন, অবাক হবে না কখনও। আচ্ছা, চলি।' চলে গেল লাসেল। নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। ঘুরে দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। পায়ে যেন আর জোর পাচ্ছি না। মনে হলো, এক নিমেষে বদলে গেছে সব। আমি আর আগের মত শুধু নার্স নই, আমি স্পাই। এগিয়ে এল মা। বুকে মাথা রাখলাম আমি।

রোজ সকালে যার গলার আওয়াজ পাই, সে ক্যান্টিন-মা। চাকা লাগানো ঠেলাগাড়িতে করে শাক-সবজি ফেরী করে। দেখতেও বেশ, তাছাড়া সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে মুখে। পাড়ার সবাই ভালবাসে বুড়িকে। মিলিটারি ক্যান্টিনে শাক-সবজি সরবরাহ করে বলে ওর নাম হয়ে গেছে ক্যান্টিন-মা। জার্মানরাও পছন্দ করে ওকে। কোথাও যেতে বাধা নেই বুড়ির।

আজ ঘুম ভেঙেছে বেশ সকালে। রাতে ভাল ঘুম হওয়ায় মনটাও খুশি খুশি। মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সূর্য উঠি-উঠি করছে। দুটো চড়ুই কি নিয়ে যেন তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে। তন্ময় হয়ে ওদের দেখছিলাম, কানে এল ক্যান্টিন-মা-র গলা। গুনগুন করে গান ধরেছে ভাঙা গলায়। বাড়ির সামনে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন, মা-মণি?'

www.shopnil.com

হেসে বললাম, 'ভাল, তুমি কেমন?'

'এই একরকম, ঈশ্বর যেমন রেখেছেন। খুব ভাল সিম আছে, নেবে নাকি? এই দেখো না,' গাড়ি থেকে এক মুঠো সিম নিয়ে আমার হাতে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা কাগজ গুঁজে দিল। যেন তার সিমের গুণকীর্তন করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'ভেতরে গিয়ে পড়ো।' তারপরই মুখটা একটু করুণ করে বলল, 'পছন্দ হলো না? ঠিক আছে, অন্য দিন আরও ভাল জিনিস নিয়ে আসব।' ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল ক্যান্টিন-মা। শুনতে পেলাম ওর গলা, 'আছে তাজা সিম, মটরশুঁটি, বরবটি। লাগবে সবজি···।'

কাগজটা হাতে পাবার সাথে সাথে কেঁপে উঠল শরীর। শুরু হয়ে গেল আমার স্পাই জীবন। যেন বোমা নিয়ে আছি হাতে এমন ভঙ্গিতে কাগজটা মুঠো করে ভেতরে ঢুকলাম। তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খুললাম কাগজটা। শুধু লেখা আছে, 'জুভেজল যাবার পথে হাতের ডানদিকে দু'নম্বর খামারবাড়িতে আজ রাত ন'টায় লিসেটির সঙ্গে দেখা করবে।'

খুশির সাথে সাথে ভয়ও হলো। বার্লিন ভ্যাম্পায়ারদের ফাঁদ নয় তো? কে জানে! সিদ্ধান্ত নিলাম, যা হয় হবে। যাব আমি।

রাত আটটা বাজার মিনিট দশেক পরে বেরোলাম। সময় রেখেছি হাতে বেশ খানিকটা। কোন কারণে আটকে গেলে বা খামারবাড়িটা খুঁজে পেতে যদি দেরি হয়ে যায় সেজন্যে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই শুরু হলো কাঁপুনি। মনে হলো, অভিসারে যাচ্ছি। মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা, ধরা পড়লে কি বলব। ঠিক করলাম, ধরা পড়লে বলব, 'আমার এক আত্মীয়ের খুব অসুখ, দেখতে যাচ্ছি।' সে আত্মীয়কে যদি দেখতে চায় তাহলেই হয়েছে! এছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই। রাতের পাস আছে আমার।

আলো হাতে বড় রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে জার্মান সৈন্য। বিপদ এড়াবার জন্যে মাঠের মধ্যে নেমে পড়লাম। আড়াআড়িভাবে খানিকটা যাবার পর উঠলাম জুভেজলের রাস্তায়। সামনেই দু'নম্বর খামারবাড়ি। পুরো শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা একটা স্রোত।

নিঃশব্দে খামারবাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ালাম। কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কোনরকমে পৌঁছলাম দরজার কাছে। হাতড়ে হাতড়ে কড়া খুঁজে নিয়ে নাড়লাম দু'বার। খটখট শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই ভেতর থেকে ভেসে এল প্রশ্ন, 'কাকে চাই?'

কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'লিসেটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

খুলে গেল দরজা। একটা হাত চেপে ধরল আমার হাত। শিউরে উঠলাম। হাতে টান পড়তেই হাঁটতে শুরু করলাম। মিনিটখানেক হাঁটার পর থামতে হলো। টোকা দেবার আওয়াজ শুনে বুঝলাম, সামনে বন্ধ দরজা। দরজাটা খুলতেই লাফিয়ে এল আলো। সামনে লাসেল। দেখলাম, আমাকে যে নিয়ে এসেছে, সে পুরুষ। তখন গলা শুনে বুঝতে পারিনি। লাসেল বলল, 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে সিগন্যাল দেবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা। আমাকে বলল, 'এসো।' ভেতরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে দিল লাসেল।

'তুমি এসেছ দেখে খুব খুশি হয়েছি,' ঘুরে দাঁড়াল লাসেল, 'আজ থেকে তুমি স্পাই। দেশের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলে। এখন থেকে তোমার ওপর যে নির্দেশ আসবে, সেটা পালনে পিছপা হবে না কখনও। রুলার্স মিলিটারি হাসপাতালের কাজ করছ বলে খুব সুবিধা হবে তোমার। বহু জার্মান অফিসার কিংবা সৈনিকের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবে। তাদের কাছ থেকে সৈন্যদলের

গতিবিধি, আর্টিলারির লক্ষ্যবস্তু, সাপ্লাই ডাম্পের ঠিকানা অথবা অন্য যে কোন খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। অতি নগণ্য মনে হলেও কোনকিছুকে অবহেলা করবে না। তোমার বা আমার কাছে তুচ্ছ এমন কোন খবরেরও আকাশছোঁয়া মূল্য থাকতে পারে হেডকোয়ার্টারের কাছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু খবর পাঠাব কি করে?'

'বলছি, অপেক্ষা করো। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের কাছে তোমার নাম লুরা। তোমার পাঠানো সংবাদের শেষে "এল" লিখবে সবসময়। মেসেজ কিভাবে লিখবে তার জন্যে সিক্রেট কোড দিচ্ছি।' আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে আবার শুরু করল লাসেল, 'পড়ে একেবারে কণ্ঠস্থ করে পুড়িয়ে ফেলবে ওটা। ছাইটুকুও যেন পড়ে না থাকে।'

কাগজটা ভাঁজ করে নিচু হলাম মোজার ভেতরে রাখার জন্যে।

'সন্দেহ হলে জার্মানরা অবশ্য ওখানেই সবচেয়ে আগে খুঁজবে,' সাথে সাথে বলে উঠল লাসেল। তাড়াতাড়ি সোজা হলাম। চুলের মধ্যে কাগজটা রাখতেই হেসে উঠল ও। বলল, 'এবারে ঠিক আছে। শোনো, এখন থেকে সব নির্দেশ ক্যান্টিন-মা-র মাধ্যমে পাবে। দেবার মত কোন খবর থাকলে কোড অনুযায়ী লিখে "এল" সই করবে। পৌঁছে দেবে রাউভিলা প্লেসের ডানদিকে দু'নম্বর বাড়িতে। গ্র্যান্ড প্লেসের কাছে। চেনো তো, বাড়িটা?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভাল কথা। বাড়িটার পঞ্চম জানালায় প্রথমে তিনবার টোকা দেবে। একটু থেমে আরও দু'বার। তেষট্টি নম্বর কাগজটা নেবে তোমার কাছ থেকে। হাত ঘুরে ঘুরে খবরটা পৌঁছে যাবে হল্যান্ড বর্ডারে। কোন প্রশ্ন আছে?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লাম আমি।

'একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। যে খবর পাবে বা পাঠাবে তার কোন চিহ্নই যেন কাজের শেষে না থাকে। পোড়াবার পরে ছাইয়ের গুঁড়োটুকুও যেন দেখা না যায়। আর এটা দেখো।' লাসেল ওর কোটের কলার ওল্টাল। দুটো সেফটিপিন। গুণচিহ্নের মত করে আটকানো। 'এটা হচ্ছে আমাদের প্রতীক। সাবধান, গুণচিহ্নের মত না হলেই কিন্তু বুঝবে ঘাপলা আছে কোথাও। আর দিনকয়েক পরেই আমাদের একজন যাবে তোমার কাছে। এই চিহ্ন দেখালে যথাসাধ্য সাহায্য করবে তাকে। বিশেষ একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসছে সে। পারলে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিও।' একটু থেমে কপালের একপাশ চেপে ধরল লাসেল। একটু চিন্তিত গলায় বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আসার কথা জেনে গেছে জার্মান গোয়েন্দাবাহিনী। তাই আজ রাতেই চলে যাচ্ছি আমি। যাবার আগে শেষবারের মত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি একটা। যদি কখনও ধরা পড়ো, জানবে, নিজের দোষেই ধরা পড়েছ। এখন থেকে তোমার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে এমন ভাব প্রকাশ করবে যেন স্পাইয়ের কাজকে প্রচণ্ড ঘৃণা করো তুমি। সবসময়ই মনে রাখবে, বার্লিন ভ্যাম্পায়াররা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আর তোমার আশেপাশেই আমাদের কেউ থাকতে পারে। কখনও তাদের কাজের খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করবে না। চলি তাহলে।'

লাসেল বেরিয়ে যাবার প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে এলাম খামারবাড়ি থেকে।

দিন কয়েক কাটল। চোখকান খোলা রেখেছি সবসময়। তবু খবর দেবার মত কিছু পাইনি। কোন নির্দেশও আসেনি।

দুপুরে হাসপাতাল থেকে ফিরছি, হঠাৎ একজনের কথায় চমক ভাঙল।

'গুড ডে, মাদমোয়াজেল,' হেসে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'আপনিই তো মার্থা

www.shopnil.com

নোকার্ট?'

অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দিন দু'য়েক থাকার ব্যবস্থা করা যাবে? মানে, একটু অসুবিধায় পড়েছি আর কি।'

চট্‌ করে নাসেলের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'চলুন, আমার সাথে। দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা!'

বাড়িতে এলাম দু'জনে। ঘরে ঢুকে চারপাশ ভালমত দেখে নিল লোকটা। তারপর কোটের কলারটা উল্টে ধরল। গুণচিহ্নের মত সেফটিপিন দুটো চকচক করে উঠল আলোয়।

বাড়ির মালিক মহিলাটিকে বলে চিলেকোঠায় ওর থাকার ব্যবস্থা করা গেল। মহিলা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন লোকটার কথা ভেবেই, 'ওটা একটা জায়গা হলো নাকি? ওখানে কোন মানুষ বাস করতে পারে?'

'কী যে বলেন, ম্যাডাম,' লোকটা হেসেই উড়িয়ে দিল তার কথা, 'রাস্তায় যে থাকতে হচ্ছে না, এটাই তো বড় কথা। আর চিলেকোঠার কথা বলছেন, সিঁড়ি হলেও আপত্তি ছিল না। তাছাড়া দু'এক দিনের ব্যাপারই তো!'

ব্যস, ব্যবস্থা হয়ে গেল লোকটার।

ঘন্টাখানেক পরেই দেখি খাসা ভাব জমিয়ে ফেলেছে বাড়ির সবক'টা ভাড়াটের সাথে। দোতলায় থাকে দু'জন জার্মান অফিসার। তাদেরকে পর্যন্ত পটিয়ে ফেলেছে ও। জার্মান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ছাড়াও আরও কয়েকটা ভাষায় আশ্চর্য দখল আছে ওর।

সাবধানতার জন্যে দু'জনেই দু'জনকে মোটামুটি এড়িয়ে চলি। হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে গেলে, 'কি, কেমন আছেন,' এ পর্যন্তই। কিন্তু খেয়াল রাখি কি করে ও। কখন প্রয়োজন পড়বে, কে জানে!

দিন কয়েকের মধ্যেই জার্মান অফিসার দু'জন একেবারে ওর জানের দোস্ত হয়ে গেল। বাড়িতে ও না থাকলে অফিসার দু'জন অস্থির হয়ে পড়ে। কি যে মজার জিনিসের সন্ধান দিয়েছিল তা সে-ই জানে। রোজ বিকেলে একসাথে বের হয় তিনজনে। ফেরে অনেক রাতে। টলতে টলতে।

দিন সাতেক চলে গেছে। একদিন সন্ধেবেলা ডিউটি থেকে এসে নাশতা করছি, লোকটা এল। হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ঠাণ্ডা আজকে, তাই না?'

হাসলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, কফি খাবেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ও। চেয়ারে বসে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে সিগারেট কেস খুলল। একটা সিগারেট বের করে ধরাল। ভুশ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল টেবিলের ওপর। ধোঁয়ার মেঘের আড়ালে ছোট্ট একটা কাগজ গুঁজে দিল আমার হাতে। ফিসফিস করে বলল, 'আজকেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।' কফির কাপে চুমুক দিল ও।

যেন খোশগল্প করছি এমন ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বললাম, 'আজকেই যাবে।'

আশেপাশে লোকজন না থাকায় মেয়েলি কৌতূহল জেগে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করছেন এখন?'

'সিক্রেট সার্ভিস,' হেসে উত্তর দিল ও।

সাথে সাথে মনে পড়ল নাসেলের উপদেশ, অন্যের কাজের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হবে না। চুপ করে গেলাম। অন্য প্রসঙ্গ তোলার আগেই দেখি জার্মান অফিসার দু'জন আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে গেল ও।

রাত। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে কে যেন। এই প্রথম খবর পাঠাতে যাচ্ছি। নাই-বা হলো নিজের জোগাড় করা, তবু তো খবর! এবং গুপ্ত খবর।

ঠিক আটটার সময় বেরোলাম। খোঁপার মধ্যে লুকনো আছে কাগজটা। কোন ঝামেলা ছাড়াই পৌঁছোলাম রাউভিলা প্লেসের ডানে দু'নম্বর বাড়িতে। মনে মনে গুণতে গুণতে এগিয়ে গেলাম, 'এক, দুই…পাঁচ।' পাঁচ নম্বর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে করে টোকা দিলাম। পরপর তিনবার। একটু থেমে আরও দু'বার। নিঃশব্দে খুলে গেল জানালাটা। আরও নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা হাত। বুঝলাম, এ-ই তেষট্টি নম্বর। খোঁপার ভেতর থেকে কাগজটা বের করে হাতটার ওপর রাখলাম। মুঠি পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হাত। বন্ধ হয়ে গেল জানালা। জানলাম না, কে তেষট্টি নম্বর, ছেলে না মেয়ে তা-ও নয়। কোনদিন যদি চোখের সামনে দেখি তাকে, হাতে হাতও যদি মেলাই, চিনব না। চিরদিন হয়তো অচেনাই থেকে যাবে সে। শুধু জানব, তেষট্টি নম্বর নামে ছিল একজন।

চার

এখন আমি পুরোপুরি স্পাই। চোখকান খোলা রেখেছি সবসময়। কিন্তু তেমন কিছুই নজরে পড়েনি। আরও সতর্ক হলাম। হয়তো সে কারণেই আমার চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

প্রতি সপ্তাহেই দেখি, সপ্তাহের কোন একটা দিনে ট্রামগুলোর ধরন-ধারণ বদলে যায়। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে শুধু যাত্রী আনা নেয়া করে ওগুলো। কিন্তু সেই বিশেষ দিনে অন্তত একটানা বারো ঘন্টা অন্য কাজ করে। লক্ষ করতেই বুঝলাম, সাপ্লাই ডিপোতে অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ পৌঁছে দেয় ওগুলো। কিন্তু এইসব অস্ত্র আর গোলাবারুদ আসে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই বাইরে থেকে। এবং ট্রেনে। উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কড়া নজর রাখলাম স্টেশনের ওপর। কয়েকদিনের মধ্যেই পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা আমার কাছে। একটা স্পেশাল ট্রেন। যে রাতে আসে, তার পরদিনই ট্রামগুলোর কাজকারবার বদলে যায়।

সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম, স্পেশাল ট্রেন আসার তারিখটা জানতে হবে। এবং খবরটা পাঠাতে হবে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সকে। সময়মত খবরটা পেলেই হলো। বৃটিশ এয়ারক্র্যাফ্ট মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে স্টেশনটাকে। ও রকম বিস্ফোরক ভর্তি ট্রেনের জন্যে গোটাদুয়েক হাই এক্সপ্লোসিভ বোমাই যথেষ্ট।

কিন্তু খবরটা পেতে হবে তার আগে। চিন্তা করলাম, কি করা যায়! স্টেশন স্টাফের সাথে ভাব জমাতে হবে। এ-ছাড়া সম্ভব নয়। হাসপাতালের কাজে প্রায়ই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে স্টেশনে যেতে হয় আমাকে। তখন যে করেই হোক ভাব জমাব স্টেশন স্টাফের সাথে। এখন শুধু অপেক্ষা। কোন এক ছুতোয় স্টেশনে যাবার।

অপেক্ষা আর করতে হলো না। পরদিন বিকেলেই হুকুম হলো স্টেশনে যাবার। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে আগেভাগেই চলে গেলাম। গিয়ে শুনি, আহতদের নিয়ে যে হসপিটাল ট্রেন আসবে, লেট সেটা। যাক, আরও কিছুটা সময় পাওয়া গেল। পায়চারি শুরু করলাম প্ল্যাটফর্মে। ইতিউতি তাকাচ্ছি, স্টেশন স্টাফ চোখে পড়ে কিনা। একটু পরেই চোখ পড়ল লোকটার ওপরে। জার্মান অফিসার একজন। স্টেশন স্টাফ। মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠল মনটা। মনে মনে আলাপ করার একটা ছুতো তৈরি করার আগেই দেখি, এগিয়ে আসছে সে। কাছে এসে বলল, 'গুড আফ্টারনুন, ফ্রাউলিন, আপনাকে আগেও বোধহয় দেখেছি এখানে। প্রায়ই আসেন, তাই না?'

www.shopnil.com

অনাবিল একটা হাসি উপহার দিয়ে বললাম, 'জ্বী, আহত সৈনিকদের নিয়ে যেতে প্রায়ই আসি।'

পকেট থেকে তাড়াহুড়ো করে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরাল অফিসার। কেসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'প্লীজ।'

হেসে বললাম, 'এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে তো ধূমপান করি না আমি!'

হাসিতেই অর্ধেক কাজ হয়ে গিয়েছিল, এবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠল অফিসার, 'ছি, ছি, আমারই দোষ। চলুন, আমার রুমে বসবেন। ট্রেন আসতে দেরি আছে বেশ খানিকটা। একটু চা-ও খাওয়া যাবে, কি বলেন?'

হেসে হাঁটতে শুরু করলাম ওর সাথে।

রুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ও আমার দিকে। আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল আমার পাশে। যেন লক্ষই করলাম না, চেয়ারটা যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে এসেছে ও। বেয়ারাকে ডেকে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। তারপর শুরু হলো কথা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর জীবনবৃত্তান্ত জানা হয়ে গেল আমার। মনোযোগী শ্রোতার মত শুনে গেলাম কথাগুলো। মাঝে মাঝে হ্যাঁ-হুঁ করে সায় দিয়ে গেলাম ওর কথায়। যখন জানাল, ওর স্ত্রী মারা গেছে তখন অতি কষ্টে মুখটা করুণ করে বললাম, 'খুব খারাপ লাগল শুনে। এরপরেও আপনাকে যুদ্ধের এই জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হলো।' এবারেও যেন খেয়াল করলাম না যে ওর একখানা হাত আমার হাতের ওপর রেখেছে।

গদগদ হয়ে কি যেন বলতে গেল, বাদ সাধল বেয়ারাটা। বেরসিকের মত জানাল, 'টেলিফোন এসেছে, স্যার।'

'দুত্তোর, তোর টেলিফোনের নিকুচি করি,' রাগে গজগজ করতে করতে উঠে গেল ও। যাবার আগে আবদারের ভঙ্গিতে বলে গেল, 'তুমি···, আপনি কিন্তু যাবেন না, হ্লাউলিন। দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

দু'মিনিট পার হবার তিন সেকেন্ড আগেই হাজির হলেন ভদ্রলোক। আবার শুরু হলো কথার ফুলঝুরি। দেখলাম, অনেক হয়েছে, এবার আসল কাজে নামতে হয়। বললাম, 'আজ তাহলে উঠি।'

গলায় আবেগের স্রোত বইয়ে বলল ও, 'আচ্ছা, আরেকদিন আপনার সাথে দেখা করা যায় না? সত্যি করে বলুন, হ্লাউলিন। এরকম স্টেশনে নয়, সুন্দর কোন জায়গায়। লোকজন বিরক্ত করবে না, এমন কোথাও?'

একচোট হেসে নিলাম মনে মনে। শুধু টোপ নয়, বাছাধন ছিপসুদ্ধ গিলে বসে আছে। বললাম, 'কেন হবে না, আমারও কি আর সে-রকম ইচ্ছে করে না?' বলেই করুণ করে ফেললাম মুখটা, 'কিন্তু হাসপাতালের ডিউটি ছেড়ে আসি কি করে?'

একটু যেন মুষড়ে পড়ল ও। বললাম, 'আচ্ছা, দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি। কাল বিকেলে···, নাহ্, পরশু···, নাহ্।' আরও কিছুক্ষণ চিন্তার ভান করে হঠাৎ উজ্জ্বল করে তুললাম মুখটা, 'তারচেয়ে আপনিই বলুন না কেন, আপনার কখন সুবিধে! আমার যত অসুবিধেই থাক, আপনার জন্যে একটু সময় করে নেব আমি।'

একেবারে জায়গামত বিঁধল তীরটা। পুরোপুরি গলে গেল প্রেমিক ভদ্রলোক। পকেট থেকে নোটবুক বের করে পাগলের মত পাতা ওল্টানো শুরু করল। যেখানে থেমে দেখা শুরু করল সে, সেখান থেকে পড়তে শুরু করলাম আমি। একটুখানি পড়তেই পেয়ে গেলাম আসল খবর। সোনার খনি একেবারে!

বুধবার। অর্ডন্যান্স স্পেশাল। আসবে তিনটায়, ছাড়বে পনেরোটায়। এর পরেই লেখা, কি কি থাকবে ওই ট্রেনে। হেভি ক্যালিবার শেল, লাইট ক্যালিবার শেল, বুলেট, এক্সপ্লোসিভ, হ্যান্ড-গ্রেনেড···। আর দেখলাম না। তার নিচে লেখা কোথায় কোথায় যাবে ট্রেনটা। ওগুলোর দিকে আর নজর দিলাম না। আসল খবর

জানা হয়ে গেছে আমার।

'শুক্রবার,' নোটবইটা বন্ধ করে বলল ও, 'বেলা তিনটের পর থেকেই ফ্রী আমি।'

'বেশ, তাহলে চারটের সময় আসব।' একটু আদুরে গলায় বললাম, 'আমি কিন্তু এই স্টেশনে বসে গল্প করতে পারব না।'

হেসে রওনা দেবার আগেই আমার একটা হাত টেনে নিল ও। চকাস্ করে চুমু খেয়ে ফেলল একটা। হাত টেনে নিয়ে হাসিমুখে বললাম, 'আসি তাহলে। শুক্রবার চারটেয়, মনে থাকে যেন।'

বেরিয়ে এলাম প্ল্যাটফর্মে। মনে মনে বললাম, 'সবকিছু ঠিক থাকলে ওই দিন তোমার সাথে দেখা করতে হলে নরকে যেতে হবে আমাকে।'

www.shopnil.com

পাঁচ

স্টেশন থেকে ফিরে একেবারেই মন বসাতে পারলাম না কাজে। ডিউটি সার্জন দু-দু'বার খুঁত ধরল। একবার একজনের ইঞ্জেকশন আরেকজনকে দিতে গিয়েছিলাম, আরেকবার থার্মোমিটারের বদলে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ ঢোকাতে গিয়েছিলাম একজনের মুখে। ডিউটি সার্জন গিয়ে রিপোর্ট করল ওবার্তাজকে। সব শুনে ওবার্তাজ বললেন, 'আসলে তোমার পরিশ্রমটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। এক কাজ করো, আজকে আর বেশিক্ষণ ডিউটি করার দরকার নেই। হাতের কাজগুলো সেরে চলে যাও। আর এর মধ্যে খানিকটা টনিক খেয়ে নাও। একটু ভাল লাগবে হয়তো।'

কাজগুলো শেষ করেই পড়িমরি করে ছুটলাম বাড়িতে। ফিরে সোজা বেডরুমে। সঙ্কেত মুখস্থই ছিল, স্পেশাল ট্রেনের খবরটা লিখে ফেললাম। এখন শুধু অন্ধকার নামার অপেক্ষা।

সন্ধ্যা নামল অবশেষে। কাগজটা ভাঁজ করে চুলের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। দরজা খুলে সাবধানে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নিঃশব্দে পা বাড়ালাম।

কোন ঝামেলা ছাড়াই খবরটা পৌঁছানো গেল তেবাট্টি নম্বরের হাতে। মনটা এত খুশি ছিল যে ব্যাপারটা প্রথমে চোখেই পড়েনি। যখন পড়ল, তখন কলজেটা লাফ দিয়ে উঠে এল গলার কাছে। পুলিস! দু'জন মিলিটারি পুলিস! আমার দরজার সামনে। একটা কথাই মনে হলো শুধু, 'এই শেষ। এবার শুধু ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো।'

থামলে সন্দেহ করতে পারে তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। কাছে যেতেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল একজন, 'হ্লাউলিন নোকার্ট?'

বোমা ফাটল মাথার মধ্যে। ওপর-নিচ মাথা নাড়লাম শুধু।

'আমাদের সাথে যেতে হবে আপনাকে।'

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। সব অনুভূতিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

'চলুন।'

নিঃশব্দে পা বাড়ালাম ওদের পিছু পিছু। শুধু মনে হলো, মায়ের সাথে আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না।

সোজা মিলিটারি পুলিসের অফিসে নিয়ে গেল আমাকে। একজন অফিসারে কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল পুলিস দু'জন।

পায়ের শব্দে মুখ তুলল অফিসার। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। চোখে চোখ রেখে বলল, 'বসুন, ফ্রাউলিন।'

বসলাম ধপ্ করে।

'লাসেল ডেলডক্ক কোথায়?' সরাসরি প্রশ্ন করল অফিসার।

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলেও অতিকষ্টে নির্বিকার থাকলাম।

'চুপ করে থাকবেন না,' প্রায় ধমকে উঠল অফিসার।

'লাসেল ডেলডক্ক আপনাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু, কথাটা জানা আছে আমাদের। আমরা আরও জানি এখানে এসেছিল সে এবং আপনাদের সাথে দেখাও করেছে। এখন কোথায় আছে সে?'

অতিকষ্টে মুখ খুললাম, 'লাসেল কোথায় আছে, কিছু জানি না। ওর সাথে শেষ দেখা ওয়েস্ট রুজবেকে। যেদিন যুদ্ধ শুরু হয়, সেদিন। আমরা তো জানতাম ও মরে গেছে। আপনার কাছেই প্রথম শুনছি যে ও বেঁচে আছে।'

'তার মানে, আপনি বলতে চান, লাসেল যে স্পাই, এ-কথাটা আপনি জানেন না?'

যেন আকাশ থেকে পড়লাম, 'স্পাই? লাসেল? অসম্ভব! ওর মত বোকাসোকা মেয়ে স্পাই? হতেই পারে না।'

'আপনি না বলছেন, কিন্তু লাসেল স্পাই।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া লাসেলের মত সাদাসিধে মেয়ে স্পাইংয়ের মত জঘন্য কাজ কোনদিনই করবে না। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে আপনাদের।'

কথা বলতে বলতে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করল আমার।

একটু হাসল অফিসার। বলল, 'ভুল হয়নি, ফ্রাউলিন। সে যাকগে, আপনাকে এত রাতে এভাবে ডেকে এনে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না। বোঝেনই তো সব। ডিউটি। পালন করতেই হয়।'

বিনয়ের অবতার সেজে গেলাম সাথে সাথে। বললাম, 'না, না, কষ্ট আর কি! সন্দেহ হলে তো করবেনই এরকম। আমি কিছু মনে করিনি।'

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, ফ্রাউলিন। আসবেন সময় করে।'

'সে তো বটেই।' ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণের আটকে থাকা কাঁপুনিটা নিঃশ্বাস হয়ে সশব্দে বেরিয়ে এল। বেঁচে গেছি। বেঁচে গেছি এ যাত্রায়।

উত্তেজনা, ক্লান্তি আর দুঃস্বপ্ন মিলে যাচ্ছেতাই কাটল রাতটা। পরদিন সকালে হাসপাতালে গেলাম বটে কিন্তু কোন কাজই করতে পারলাম না ভালমত। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি আর ঘুম। কি যে করছিলাম নিজেও জানি না। অবস্থা দেখে ডিউটি সার্জন হাত ধরে নিয়ে গেল ওবার্তাজের কাছে। আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই ওবার্তাজ বললেন, 'যাও, আজকে কাজ করতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে সারাদিন ঘুমোবে। এক্ষুণি যাও।'

বাড়িতে গিয়ে কোনরকমে চারটে খেয়ে নিয়েই ধপাস্। একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে আবার। বাথরুমে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এলাম। অনেকটা ভাল লাগল।

তাড়াতাড়িই খেয়ে নিলাম রাতের খাবার। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। শুয়ে শুয়ে শুনছি দেয়াল ঘড়ির টুং টাং শব্দ। দশটা। এগারোটা। বারোটা। তিনটে বাজতে আর কত দেরি? শুয়ে শুয়ে এভাবে অপেক্ষা করাটা অসহ্য। বসে থাকতে আরও খারাপ লাগে। খালি এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম।

'কি রে, হলো কি তোর?' ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল মা, 'শরীর খারাপ?'

'না, না, কিছু না, ঘুমোও তুমি।'

দুটো বাজল। ক্লান্তি এসে ভর করেছে শরীরে। কিছুটা তন্দ্রাও। উঠে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এলাম আবার। সময় যেন আর কাটে না। খাটের সাথে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় চোখ বন্ধ করে থাকলাম। ওভাবে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেও জানি না। হঠাৎ মায়ের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, কি হয়েছে। এক মুহূর্ত পরেই মাথায় ঢুকল চিৎকারের মানে, 'বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে। শিগগির সেলারে চল।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বললাম, 'ভয় পেয়ো না। সেলারে যেতে হবে না। দেখো, কি হয়!'

উঠে গিয়ে সাবধানে জানালার পাল্লা খুললাম। জোরাল হয়ে উঠল অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফগানের গর্জন। সার্চলাইটের তীব্র আলো চিরে দিচ্ছে ঘন অন্ধকার। একটু পরেই কানে এল বম্বারের আওয়াজ। তীব্র শব্দে গুরুগুরু করে উঠল বুকের মধ্যে। হঠাৎ কান ফাটানো প্রচণ্ড আওয়াজে ঝনঝন্ করে কেঁপে উঠল ঘরবাড়ি। বোমা পড়েছে। তাড়াতাড়ি কান পাতলাম। নাহ্, আর শব্দ নেই এখন। হতাশায় ভরে গেল মন। জায়গামত পড়েনি বোমাটা।

অসংখ্য মেশিনগানের কাপড় ছেঁড়া আওয়াজে চমকে উঠলাম। এমন সময় চোখে পড়ল বম্বারটাকে। খাড়া নেমে আসছে নিচে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। পড়ে যাচ্ছে নাকি? নাহ্, সমান্তরাল হচ্ছে মাটির সাথে। কিন্তু পরক্ষণেই অবিশ্বাস দুঃখ হতাশা ক্রোধ একসাথে ভর করল মনে। একটা। একটা মাত্র বম্বার এসেছে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। এই জন্যে এত কষ্ট করে খবর পাঠিয়েছিলাম? খবরটাকে এত হালকাভাবে নিল ওরা!

দুঃখে মাথা নিচু করে ছিলাম। থরথর করে কেঁপে উঠল ঘরটা। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা। আধ সেকেন্ড পরেই সবক'টা নরক ভেঙে পড়ল একসাথে। পুরো স্টেশনটা যেন লাফ দিয়ে উঠে গেল শূন্যে। তারপর একনাগাড়ে শুরু হলো শেল গোলাবারুদ আর বিস্ফোরকের অবিশ্রান্ত আর্তনাদ। ফাটছে তো ফাটছেই।

খুশিতে পানি এসে গেল চোখে। আস্তে করে মাথা তুলে তাকালাম আকাশে। এখনও সেখানে আলোর ছুটোছুটি। হঠাৎ বুকের মধ্যে খামচে ধরল কেউ। লেজে আগুন নিয়ে খাড়া নেমে আসছে বম্বারটা। গুলি খেয়েছে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলাম। মোচড় খেয়ে সোজা হবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বম্বারটা। একটু পরেই ভেসে এল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাতব আওয়াজ।

হুহু করে উঠল বুকের মধ্যে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। দু'চোখের বন্যায় ভিজে গেল বালিশ। উৎকণ্ঠিত হয়ে ছুটে এল মা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? অ্যাঁ? কি হলো?'

অনেকক্ষণ পরে শান্ত হলো মনটা। ধরা গলায় বললাম, 'আমার জন্যে এতগুলো মানুষ মারা গেল আজকে।'

মাথায় হাত বুলানো থেমে গেল মা'র। কয়েক মুহূর্ত গেল কথাটার মানে বুঝতে। তারপর আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এ না হলে আরও কত মানুষ মারা যেত, ভেবে দেখেছিস? এ'তো মন্দের ভাল।'

ঘুমিয়ে পড়ার আগে কেন যেন স্টেশনের সেই অফিসার আর শুক্রবারের কথা মনে পড়ল আমার।

www.shopnil.com

www.shopnil.com

ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে রুলার্সে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জার্মান মিলিটারি পুলিস আর বার্লিন ভ্যাম্পায়ার। হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তবেই যাওয়া যায় কোথাও।

সারাক্ষণই আতঙ্কিত হয়ে আছি। কোন জার্মান সৈনিক বা অচেনা কেউ মুখের দিকে তাকালেই হলো। মনে হয়, আমার মনের কথা পড়ে নিয়েছে সে। নিঃশব্দে কুটিল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এবার জিজ্ঞেস করবে, 'মার্থা নোকার্ট, আপনার গুপ্তচরগিরি কেমন চলছে?'

এত আতঙ্কের মধ্যে থাকার ফলে প্রচণ্ড রকমের ক্লান্তি জমল শরীরে। সামান্য পরিশ্রমেই অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। অবস্থা দেখে ওবার্তাজ ডাকলেন একদিন। ওঁর রুমে যেতেই বললেন, 'এভাবে কাজ করলে স্রেফ মারা পড়বে তুমি। দু'দিন ছুটি নাও। শুধু বিশ্রাম নেবে এ দু'দিন। কোন কাজ নয়।'

চুপ করে থাকলাম। কথাটা আগেই ভেবেছি আমি। কিন্তু সম্ভব নয়। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সবকিছু ভুলে থাকতে পারব। চুপচাপ বসে থাকলেই আতঙ্ক কুড়ে কুড়ে খাবে আমাকে। বললাম, 'আপনি ভাববেন না। শরীরটা সামান্য একটু দুর্বল, তবে অসুবিধে হবে না। এখন ছুটির দরকার নেই আমার।'

কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওবার্তাজ। তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে। যা ভাল মনে করো, করো।'

চলে এলাম ওখান থেকে।

দিন কয়েক পরে ওবার্তাজের রুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, কানে এল, 'তিন নম্বর অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশনের সার্জন আহত। বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর। কিন্তু এখান থেকে পাঠানোর মত কেউ তো নেই এখন। চারজন ডাক্তারের মধ্যে ওয়ারেজ আর ন্যাগল গেছে আট নম্বর হাসপাতালে। আজ সকালেই গেল। কবে ফিরবে ঠিক নেই। সাদারমানের নিউমোনিয়া। বাকি শুধু আমি। কাকে পাঠাই বলো? আমি তো আর হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারি না!'

'একজন আন্ডার-অফিসারও কি দেয়া যায় না?' অপরিচিত একটা গলা ভেসে এল, 'ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কোনরকমে চালিয়ে নেবার মত?'

'আন্ডার-অফিসার ভাল ড্রেসার হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারির কি জানে ও? অপারেশন তো আর ওকে দিয়ে হবে না!'

আর কোন কথা শোনা গেল না। বুঝলাম, চুপচাপ বসে আছে অন্যজন। ভাবছে কি করবে এখন।

সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন মানে, ফ্রন্ট লাইনের পেছনে একেবারে। একবার যেতে পারলে দামী খবর একটা না একটা জোগাড় হবেই। ওদের এখন দরকার ডাক্তার অথবা মোটামুটি ডাক্তারি জানে এমন কাউকে।

নক করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঘুরে তাকাল অপরিচিত লোকটা। ওবার্তাজকে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি কিছুটা। আমি রাজি আছি যেতে। মেডিকেল কলেজে তো পড়েছি আমি। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারব।'

অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ওবার্তাজ। তারপর বললেন, 'অসম্ভব! হাজার হলেও তুমি মেয়ে। যুদ্ধ যুদ্ধই। অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন কি জিনিস জানো তুমি?'

হেসে বললাম, 'ওয়েস্ট রুজবেকে থাকার সময়ই ওটা জানা হয়ে গেছে। আমার কোন অসুবিধে নেই। আপনি অনুমতি দিলেই যেতে পারি।'

গলার স্বর বদলে গেল ওবার্তাজের। গাঢ় স্বরে বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। জেনেশুনে যে বিপদের মধ্যে কাজ করতে যাচ্ছ এজন্যে তোমাকে কিভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না। তোমার কথা ওপরওয়ালাদের বলব আমি।'

ঘণ্টাখানেক পরে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলাম। লম্বা আর্মি গ্রেট কোট পরেছি একটা। নিজের চেহারা দেখে নিজেরই হাসি পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে গোলার আওয়াজ। বুঝলাম, এসে গেছি ফ্রন্টে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। কোনকিছু না ভেবেই সীটের নিচে মাথা গুঁজে দিলাম। শব্দের রেশ কাটলে মাথা তুললাম। হোহো করে হেসে উঠল ড্রাইভার। বলল, 'শত্রুর গোলা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, ফ্রাউলিন।'

কোনরকমে দাঁতগুলো দেখালাম। অর্থাৎ হাসলাম।

প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ফ্রন্টের আওয়াজ। খানিকটা এগোনোর পর চোখে পড়ল তীর ফলক। তাতে লেখা, তিন নম্বর ড্রেসিং স্টেশন। ডানে মোড় নিয়ে এগিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। একটু পরেই চোখে পড়ল ড্রেসিং স্টেশনটা। গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে নেমে পড়ল ড্রাইভার। দু'জনেই এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে।

কাছাকাছি যেতেই বেরিয়ে এল একজন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, ফ্রাউলিন, আমি এই স্টেশনের মেডিকেল ফিল্ডওয়েবেল। হের ওবার্তাজ টেলিফোনে আপনার কথা জানিয়েছেন। আসুন, আমার সাথে।' রওনা হলাম ওর পেছনে। যেতে যেতে ফিল্ডওয়েবেল বলল, 'স্টেশনটা তো নরক এখন! দেখি আপনার জন্যে কতটা করতে পারি।'

ভেতরে ঢুকেই কেঁপে উঠল সারা শরীর। বীভৎস দৃশ্য। চারটে বিকৃত লাশ। ঘরের কোণে পড়ে আছে। ছেঁড়া একটা ওভারকোট দিয়ে কোনরকমে ঢেকে রাখা হয়েছে লাশগুলো। তার ঠিক পাশেই জনাতিনেক আরদালি নির্বিকারভাবে ধোঁয়া ছাড়ছে আর মশগুল হয়ে আছে গল্পে। মাঝে মাঝে হোহো করে হেসে উঠছে অশ্লীল কোন কথায়। আরেক কোণে বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন ইংরেজ সৈনিক। তার পাশে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে পড়ে আছে জার্মান একজন।

'একটু বিশ্রাম করে নিন, ফ্রাউলিন,' একটা প্যাকিং বাক্স ঠেলে দিল ফিল্ডওয়েবেল, 'বলা যায় না, এখুনি হয়তো কাজ শুরু করতে হবে আপনাকে। তখন বিশ্রাম তো দূরের কথা, নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পাবেন না।'

বাক্সটার ওপর বসলাম। ক্যাঁচক্যাঁচ করে আপত্তি জানাল বাক্সটা।

'এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিন,' একটা প্লেটে খটখটে একটা রুটি আর তেমনি খানিকটা মাংস এগিয়ে দিল ফিল্ডওয়েবেল, 'কাজে নামার পর আর সময়ই পাবেন না। এই যে, শোনো,' একজন আরদালির দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল ফিল্ডওয়েবেল, 'দুই মগ চা নিয়ে এসো।'

খাবারের অপূর্ব চেহারা দেখে মুহূর্তে খিদে চলে গেল আমার। বললাম, 'ধন্যবাদ। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। পরে খাব।'

হেসে খাওয়া শুরু করল ফিল্ডওয়েবেল। বেশ খানিকক্ষণ চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'খেয়ে নিলেই কিন্তু ভাল করতেন।'

খাওয়া শেষ হবার আগেই অনেক লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে। লাফিয়ে উঠল ফিল্ডওয়েবেল। রুটির শেষ টুকরোটুকু ঠেসে দিল মুখে। মুখভর্তি খাবার নিয়ে কোনরকমে বলল, 'আর খেতে হবে না, এসে গেছে ওরা।'

এক ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল আরদালি আর স্ট্রেচার ভর্তি আহত সৈনিক। মুহূর্তে ভরে গেল ঘর। ছুটে গেলাম আহতদের দেখতে।

একজনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। খুব সম্ভব হাতটা কেটে ফেলতে হবে। ওর দিকেই নজর দিলাম আগে। ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়, 'আর পারি না। মরফিয়া দাও! মরফিয়া!'

সাথে সাথে চারপাশ থেকে চিৎকার শুরু হলো, 'মরফিয়া দাও। মরফিয়া। তাড়াতাড়ি!'

ছুটে গেলাম ফিল্ডওয়েবলের কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'মরফিয়া আছে? সবাই মরফিয়া চাইছে।'

'অত মরফিয়া পাব কোথায়?' ফিসফিস করে বলল ফিল্ডওয়েবল, 'সবাইকে দিতে গেলে তো মরফিয়ার একটা পুকুর লাগবে।'

'তাহলে?'

'ব্যবস্থা করছি, দাঁড়ান।'

পাশের রুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা বোতল নিয়ে এল ফিল্ডওয়েবল। লেবেল দেখলাম। মরফিয়া। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ভর্তি মরফিয়া দিয়ে দেওয়া শুরু করল ফিল্ডওয়েবল। একবার ভর্তি করে চার-পাঁচজনকে। সাথে সাথে থেমে গেল চিৎকার। একটু ফাঁক পেতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে যে বললেন···।'

'ডিসটিল্ড ওয়াটার!' সমানে ইঞ্জেকশন দিয়ে চলল ফিল্ডওয়েবল।

দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেল রাতটা। শুধু মনে আছে, কসাই হয়ে গিয়েছিলাম। একটার পর একটা অপারেশন। হাত কিংবা পা কেটে বাদ দেয়া, সব করেছি। সেদিনই প্রথম বুঝলাম, যুদ্ধ কতটা ভয়ঙ্কর। আর যুদ্ধে মানুষ কতরকমভাবে আহত হতে পারে। জীবনে কোনদিন চিন্তাও করিনি যে অপারেশন বা অ্যামপুটেশন নিজের হাতে করব। ছুরি কাঁচি চিমটা—এসব স্টেরিলাইজ করা তো দূরের কথা, ভালমত পরিষ্কারও করার সময় ছিল না। মনে হচ্ছিল কসাইরাও বোধ হয় পশু জবাইয়ের সময় এর চেয়ে পরিষ্কার ছুরি ব্যবহার করে।

একসময় ফিল্ডওয়েবল এসে এক গ্লাস মদ ধরিয়ে দিল হাতে। বলল, 'সাদা চোখে এ কাজ করতে পারবেন না, ফ্রাউলিন। এ-কসাইখানার চেয়েও বেশি।'

কোন কথা না বলে ঢকঢক্ করে খালি করে ফেললাম গ্লাসটা। জ্বলতে জ্বলতে নিচে নেমে গেল তরল আগুন।

নেশার ঘোরে যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছি। বাইরে অবিশ্রান্ত গোলা ফাটার আওয়াজ। কখনও দূরে, কখনও একেবারে কাছে। কানে তালা লেগে গেছে শব্দে। মাঝে মাঝে পুরো ঘরটা থরথর করে কেঁপে উঠছে। মনে হয়, এখুনি বুঝি ধসে পড়বে। কেন যে এখনও মাটির সাথে মিশে যায়নি ক্যাম্পটা, ভেবে অবাক লাগল।

কাজ করতে করতে হঠাৎ প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল। মনে হলো নাড়িভুঁড়ি একেবারে হজম হয়ে যাবে। ফিল্ডওয়েবলের কথাটা মনে পড়ল সাথে সাথে। দুঃখের সাথে মনে মনে স্বীকার করলাম তখন খেয়ে নিলেই ভাল হত।

সকাল ন'টা পর্যন্ত একটানা কাজ করলাম। আহতদের পাঠিয়ে দিয়ে যখন অ্যাম্বুলেন্সে চেপে বসলাম, তখন একবিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই শরীরে। সীটে হেলান দিয়ে মড়ার মত পড়ে থাকলাম। রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

দুলতে দুলতে চলেছি। কালকের সেই ড্রাইভারই চালাচ্ছে গাড়ি। আশপাশ থেকে মাঝেমাঝেই শূন্যে উঠে যাচ্ছে মাটি ইট পাথর। সেই সাথে গোলা ফাটার শব্দ। হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে সাথে চোখের সামনে দুলে উঠল সবকিছু। অন্ধের মত কিছু ধরার জন্যে হাত বাড়ালাম। প্রচণ্ড একটা আঘাতের সাথে সাথে মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল কয়েকটা সূর্য। তারপরই অন্ধকার হয়ে গেল সব।

জ্ঞান ফিরলে দেখি, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার এলফন্স অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখেছে আমাকে। আমার জ্ঞান ফিরতেই এগিয়ে গেল অন্যদের দিকে।

একজন স্ট্রেচার-বাহক পড়ে আছে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে। দেখেই বুঝলাম, মারা গেছে ও। গাড়ির যে অবস্থা তাতে ওটার আশা আর না করাই ভাল।

জ্ঞান ফেরার পর থেকেই প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো হাতে। তাকিয়েই চমকে উঠলাম। রক্তে ভিজে গেছে বাঁ হাত। আস্তে আস্তে তীব্র হয়ে উঠল ব্যথা। ব্যথায় গড়াগড়ি দেবার অবস্থা হলো আমার।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, একদল সৈনিক আসছে মার্চ করতে করতে। আমাদের অবস্থা দেখে ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্ট সাথে সাথে হুকুম দিল একজনকে, 'সোজা হাসপাতালে গিয়ে খবর দাও। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসবে। একছুটে যাবে। লরি, সাইকেল ঘোড়া যা পাও নিয়ে যাবে।'

অসহ্য কষ্টে কাটল সারা দুপুর, সারা বিকেল। রাত আটটার দিকে এল অ্যাম্বুলেন্স। হাসপাতালে যখন পৌঁছোলাম তখন বেঁচে আছি না মরে গেছি সে বোধটুকুও অবশিষ্ট নেই। ডাক্তার তাড়াতাড়ি কোটের হাতা গুটিয়ে দিল। আঘাতটা মারাত্মক না হলেও রক্ত ঝরেছে প্রচুর। সেজন্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। ক্ষতটা ভালমত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিল ডাক্তার। অনেকটা ভাল লাগল। নির্জীবের মত আধশোয়া হয়ে দেখতে লাগলাম ওদের কাজকর্ম।

বুটের খট্‌খট্ শব্দে পুরোপুরি চোখ মেললাম। দু'জন মিলিটারি পুলিস ঢুকল। সাথে আহত একজন। তার গলার অর্ধেকটা প্রায় নিখুঁতভাবে কাটা। দেখেই বুঝলাম, বড়জোর আর পাঁচ মিনিট আয়ু আছে ওর।

কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। নাইট সার্জনকে খবর পাঠিয়ে গেলাম লোকটার কাছে। নাইট সার্জন না আসা পর্যন্ত ওকে দেখাটা আমার কর্তব্য। দুর্বল শরীর নিয়েই ভাল করে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করলাম ওকে। মাথাটা সোজা করে রাখতে গিয়ে কোটের কলারটা উল্টে গেল ওর। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। একজোড়া সেফটিপিন। কিন্তু গুপ্তচিহ্নের মত নয়।

www.shopnil.com

ছয়

মার্চের মাঝামাঝি। সোনা রোদে ঝিকিমিকি করছে সকাল। বাবা এল। তাড়াতাড়ি কফি বানিয়ে নিয়ে এলাম। কফিতে চুমুক দিয়ে বাবা বলল, 'গির্জার গা ঘেঁষে একটা কাফে আছে। ক্যাক্লিন কাফে। লোকজন থাকারও ব্যবস্থা আছে। ওটার মালিক একেবারে পানির দামে বিক্রি করতে চাইছে। কাফেটা কিনব নাকি?'

লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'কিনে ফেলো, বাবা, কিনে ফেলো। আমরা তাহলে তোমার সাথে থাকতে পারব। এভাবে আলাদা থাকতে আর ভাল লাগে না।'

হেসে ফেলল বাবা। বলল, 'পয়সা-কড়ি আছে তো?'

সাথে সাথে ছুটলাম আমি আর মা। বাক্স-পেটরা ঝেড়েঝুড়ে দেখা গেল, হয়ে যাবে।

টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেল বাবা। সারারাত উত্তেজনায় ঘুম এল না। পরদিন দুপুরের মধ্যেই আমরা উঠে এলাম কাফেতে।

কাফেটা চমৎকার। গির্জার একেবারে গা ঘেঁষে। আর ফ্রন্টের ঠিক উল্টোদিকে। ফলে আরও সুবিধে। গোলা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কাফেতে মালিক আর তার পরিবারের জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট। ওপরে ভাড়া দেয়ার মত গোটাকয়েক কামরা। সবচেয়ে বড় কথা, সবাই একসঙ্গে থাকতে পারব। এতদিন ঘরের অভাবে বাবাকে অন্য জায়গায় থাকতে হত।

দুটো নতুন মেয়ে রাখা হলো কাফে চালানোর জন্যে। মাঝে-সাঝে আমিও বসি। দেখলাম, অত্যন্ত উপকারে আসবে কাফেটা। প্রচুর জার্মান অফিসার আসবে এখানে। গিলবে প্রচুর। কথাবার্তাও চালাবে সেই সাথে। আর মাতাল হয়ে গেলে তো কথাই নেই। যা কানে আসবে তার মধ্যে দামী কিছু না থেকেই পারে না। তবে অসুবিধেও আছে। প্রচুর জার্মান গোয়েন্দা আর মিলিটারি পুলিসও আসবে। আমি মালিকের মেয়ে বলে নজরটা একটু বেশিই দেবে এদিকে।

অন্য একটা আশঙ্কা করছিলাম ক'দিন থেকে। একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরেই বুঝলাম, যা ভেবেছিলাম তাই। কাল থেকে তিনজন জার্মান অফিসার থাকবে ওপরে। আপত্তি করবার উপায় নেই। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে ঘর খালি থাকতে জায়গা দেবে না ওদের?

পরদিনই এসে গেল তিনজন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রাখলাম চেহারা। একজনের বয়স বেশ কম। কলেজ-ছাত্রের মত। চেহারাটাও বেশ। কথাবার্তায়, চালচলনে পুরোপুরি ভদ্রলোক। ব্যবহারও মার্জিত। ভালই লাগল ওকে। বেশ হাসিখুশিও। সুযোগ পেলেই গল্প করতে আসে। আর গল্পও করতে পারে! ওর কথায় প্রথম দিনেই জানলাম, যুদ্ধের আগে প্যারিসে পড়াশোনা করত ও। বেলজিয়ামের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। এমন চমৎকার ভঙ্গিতে যুদ্ধের গল্প করত যে যুদ্ধের বীভৎসতা ফুটে উঠত চোখের সামনে। দেশের অবস্থার নিখুঁত বিশ্লেষণ করত আমার কাছে। সত্যি বলতে কি, প্রায় তন্ময় হয়েই ওর কথা শুনতাম।

একদিন বসে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ বলল, 'জার্মানদের পরিপূর্ণ বিজয় এসে গেছে, ফ্রাউলিন। আর ক'টা দিন মাত্র।'

বুকের মধ্যে দুরমুজ-পেটা শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে। মুখের ভাব একটুও না বদলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি? জানলেন কি করে?'

'জানি বলেই বলছি। আর সপ্তাহ খানেক। তারপর দেখবেন।'

কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই দেখি অন্য দু'জন অফিসার ঢুকছে কাফেতে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে উঠে এলাম। আসার আগে একটু বাঁকা চোখে হেসে বললাম, 'পরে কথা বলব।'

তারপর থেকেই খচখচ করতে থাকল মনের মধ্যে। চূড়ান্ত বিজয়ের ব্যাপারে ও এত নিশ্চিত কেন? কি হতে যাচ্ছে? যে করেই হোক, জানতে হবে ব্যাপারটা।

তিন নম্বর অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশনে আহত ইংরেজ সৈনিক দেখার পর থেকেই মাথায় ঘুরছিল চিন্তাটা। রুলার্সের হাসপাতালেও যখন দু'জন ইংরেজ সৈনিক এল, তখনই ঠিক করলাম পালানোর ব্যবস্থা করে দেব ওদের। হল্যান্ড সীমান্ত বেশি দূরে নয়। দরকার শুধু বেসামরিক পোশাক আর পথখরচা।

দিন কয়েকের মধ্যেই জিনিসগুলো জোগাড় হয়ে গেল। হাসপাতালে গিয়ে ওদের ওয়ার্ডের পাশে একটা রুমে লুকিয়ে রাখলাম ওগুলো। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ডিউটি আজ। সাড়ে পাঁচটার দিকে আরেকবার ঢুকলাম ওয়ার্ডে। সবার বিছানার পাশ দিয়ে ঘুরলাম। মাঝে মাঝে থামি, দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আবার এগোই। ওদের বিছানা দুটো পাশাপাশি। দু'বেডের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খবর, জিমি? কেমন আছ, আর্থার?'

'কোনরকম।'

যেন সান্ত্বনা দিচ্ছি এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বললাম, 'পাশের ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে পোশাক আর টাকা আছে। অন্ধকার হলেই পালিয়ে যেয়ো।' এবার স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'ও কিছু নয়। এই তো, ভাল হয়ে উঠলে বলে।' বাকি বেডগুলোর পাশ দিয়ে নাম কা ওয়াস্তে ঘুরেই ছুটলাম রুমে।

এসে দেখি, পৌনে ছ'টা বাজে। চোখের সামনে একটা পত্রিকা খুলে ধরলাম। সোজা করে না উল্টো করে তা-ও জানি না। কোন অক্ষরই চোখে পড়ল না। শুধু কালো কালো পিঁপড়ের সারি যেন।

বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ অ্যালার্ম বেলের তীব্র খড়খড়ে আওয়াজে লাফিয়ে উঠলাম। এক ধাক্কায় চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে ছুটলাম ওয়ার্ডে। ধাক্কা খেলাম দু'জন সার্জেন্টের সাথে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে? অ্যালার্ম...।'

'কি হয়েছে?' প্রায় ধমকে উঠল সার্জেন্ট, 'আপনার ওয়ার্ড থেকে দু'জন ইংরেজ সৈনিক পালান। কোথায় ছিলেন আপনি?'

'যেখানেই থাকি না কেন, আমার ডিউটি ছ'টায় শেষ। আর এখন বাজে আটটা,' ঝাঁঝাল গলায় বললাম, 'তাছাড়া আমার ওপর পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল না নিশ্চয়ই?'

গজগজ করতে করতে চলে গেল দু'জন। চিৎকার আর ছুটোছুটিতে ততক্ষণে হাট বসে গেছে হাসপাতালে।

খুশি মনে রুমে ফিরে এলাম আমি।

অবস্থা মোটামুটি শান্ত হবার পর বাসায় ফিরলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি এলফন্স আর স্টিফেন। এলফন্সের সাথেই কাজ করে ও। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। ধরেই নিলাম, ধরা পড়ে গেছে ইংরেজ দু'জন। কোনরকমে বললাম, 'কি ব্যাপার? আবার হাসপাতালে যেতে হবে নাকি?'

'না, না,' হেসে উঠল স্টিফেন, 'হঠাৎ ছুরিতে হাত কেটে গেল। ও বলল আপনার কথা, ড্রেসিং করে দেবেন। তাই চলে এলাম।'

আরও বেড়ে গেল ধুকপুকানিটা। সামান্য ছুরির কাটা। এলফন্স নিজেই ব্যান্ডেজ করে দিতে পারত। আমার কাছে এল কেন? বললাম, 'এ তো সাধারণ ব্যাপার। এখনই করে দিচ্ছি। কোথায় কেটেছে?'

'আপনার দু-মুখো কাজ ভালই চলছে সিস্টার, কি বলেন?' হঠাৎ হাসিহাসি মুখে বলল স্টিফেন।

হার্টবিট মিস্ হয়ে গেল একটা। এক নিমেষে সাদা হয়ে গেল মুখ। এবার শেষ আমি। পরমুহূর্তেই রক্ত ফিরে এল মুখে। মনে হলো, অন্য কারও গলায় স্টিফেন বলছে, 'ব্যান্ডেজ বাঁধতে তো সেফটিপিন লাগবে আপনার, তাই না?'

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল আমার। দ্রুত বললাম, 'আছে আপনার কাছে?'

'দেখি, পাই কিনা,' কোটের কলারটা উল্টে ধরল স্টিফেন। আছে। দুটো সেফটিপিন। গুণচিহ্নের মত করে আটকানো।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, 'আমার কাছেও তো থাকার কথা। দেখি, আছে কিনা।' ইউনিফর্মের বোতাম খুলে কলার উল্টে ধরলাম।

'আমার কাছেও ছিল কিন্তু,' কলার উল্টে বলল এলফন্স। একসাথে হেসে উঠলাম তিনজন। হাসি থামলে বললাম, 'সবাই তাহলে এক নৌকায়ই চড়েছি। কিন্তু আমার কথা জানলেন কার কাছে?'

'ক্যান্টিনের সার্জেন্ট মেজরের কাছে।'

www.shopnil.com

হাসি বন্ধ হয়ে গেল আমার। এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে মনে হলো কথাটা। ফাঁদে আটকে গেছি আমি। মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, 'উনি জার্মান···।'

'উনি জার্মান নন,' বাধা দিয়ে বলল এলফন্স, 'ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি কলেজের ক্যাডেট ছিলেন উনি। যুদ্ধ শুরু হবার আগে জার্মানীতে আসেন। তারপর তো বুঝতেই পারছেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু উনি আমার কথা জানলেন কি করে?'

'উনিই তো আমাদের গার্জেন,' হেসে বলল এলফন্স, 'মানে, খবর পাঠানোর মিডিয়াম। আজকেই বদলি হয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন আপনার কথা। তাইতো লুবার সাথে দেখা করার জন্যে চলে এলাম।' বলেই হোহো করে হেসে উঠল এলফন্স। ভাবখানা, যেন চমৎকার গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছি আমরা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আছে কিছু পাঠাবার মত?'

'তার আগে বলুন তো, অটোফন প্রমূট্ নামে কোন লোককে চেনেন কিনা?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন? চিনি তো! আমাদের ওপরেই থাকে। চমৎকার ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। তাছাড়া···।'

'তার মানে, আপনার বেশ পছন্দ ওকে, তাই না?' বাধা দিয়ে বলল স্টিফেন।

রাগ হলো ওর কথায়। একটু বিরক্তির সাথে বললাম, 'আমার ভাল লাগল কি না লাগল তাতে কি আসে যায়! আমার কাছে ওকে ভাল মনে হয়েছে, ব্যস।'

'বুঝলাম। কিন্তু ওই ভাল লোকটার কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থাকবেন। ভদ্রলোক জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট।'

চমকে উঠলাম, 'বলেন কি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তার মানে, আমাকে সন্দেহ করেছে কোন ব্যাপারে?'

'শুধু আপনাকে নয়, সব বেলজিয়ানকেই সন্দেহ করে ওরা।'

'আমি ব্রিগেড মেজরের সেনর অফিসে কাজ করি,' স্টিফেন বলল, 'সেজন্যে মাঝে মাঝে এর ওর চিঠি পড়ার সুযোগ পাই। ও ব্যাটার একটা চিঠি পড়েছিলাম একবার। ওর মা'কে লিখেছিল, একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এখানে আছে ও। এখন আপনার কাজ হবে, ওর এই "দায়িত্বপূর্ণ" কাজের হদিসটা বের করা।'

বললাম, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। অনেক উপকার করলেন আমার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল স্টিফেন। পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বের করে বলল, 'আজকেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

কাগজটা চুলের মধ্যে রাখতে রাখতে বললাম, 'নিশ্চিন্তে থাকুন। আজকেই যাবে এটা।'

বেরিয়ে গেল ওরা। পোশাক পাল্টে আমিও বেরোলাম। নিরাপদেই তেষট্টি নম্বরের হাতে পৌঁছে গেল কাগজটা।

ভোর। মায়ের সাথে নাশতা খাচ্ছি, কানে এল ক্যান্টিন মা-র গলা, 'আছে তাজা শাক সবজি।' তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোলাম। গাড়ি থামিয়ে দামদস্তুর করার ভান করে কথাবার্তা চালালাম। 'শোনো,' ক্যান্টিন-মা বলল, 'চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে জার্মানরা। অনেক চেষ্টা করেও খবরটার রহস্য ভেদ করা যায়নি। তুমি দেখো তো, পারো কিনা।'

কিছু শাক-সবজি কিনে ঘরে ফিরলাম।

তারপর খবর পেলাম স্টিফেনের কাছ থেকে। ও জানাল, আমাদের দোতলার বাকি দু'জনের একজন হচ্ছে রিচমান। এই লোক বাতাসের গতিবিধি আর

আবহাওয়ার রিপোর্ট পাঠাচ্ছে নিয়মিত।

খোঁজ নেয়া শুরু করলাম। জানা গেল, রিচমান বৈজ্ঞানিক। যুদ্ধের আগে কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াত। দেখলাম, তার নামে যেসব পত্রিকা আসে, সবই সায়েন্টিফিক জার্নাল। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হলো। সাথে সাথে খবর পাঠিয়ে দিলাম তেষট্টি নম্বরের হাতে। ঠিক তিন দিন পরে উত্তর পেলাম। ক্যান্টিন-মা দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে খুললাম কাগজটা। লেখা আছে, 'আবহাওয়া রিপোর্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সৈন্য বা অ্যামুনিশন ট্রেনের গতিবিধি অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবর দেবার চেষ্টা করুন।'

লেখাটা পড়ে এত রাগ হলো যে যতক্ষণ ছেঁড়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কুটিকুটি করে ছিঁড়লাম কাগজটা। পুড়িয়ে ফেলেও মনের ঝাল মিটল না। ভাবলটা কি ওরা আমাকে?

ঠিক দু'দিন পরে খবর দিল এলফন্স। ক্লোরিন ভর্তি হাজার হাজার সিলিন্ডার এনে জমা করা হচ্ছে সাপ্লাই ডিপোতে। মাথা খারাপ হবার জোগাড় হলো আমার। একদিকে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক অন্যদিকে ক্লোরিন সিলিন্ডার। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত রহস্যজনক। কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারছি না। নাসেলের কথা মনে হলো আরেকবার। কে জানে, প্রচণ্ড মূল্যবান কোন খবর হতে পারে এটা। পাঠিয়ে দিলাম।

তিন দিনের মাথায় উত্তর এল আবার। ক্যান্টিন-মা-ই দিয়ে গেল। লেখা আছে, 'শুধু অনুমানের উপর নির্ভর না করে নিশ্চিত খবর দেবার চেষ্টা করুন।'

এ কাগজটা আরও বেশি টুকরো টুকরো হলো। এত রাগ হলো যে একবার মনে হলো ছেড়ে দিই সবকিছু।

এর পরে অধ্যাপক আর ক্লোরিন সিলিন্ডারের ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার থাকলাম।

এপ্রিল মাসে সাজসাজ রব পড়ে গেল হাসপাতালে। হাই-কমান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে, সিরিয়াস কেস ছাড়া সব রোগীকে সরিয়ে নিতে। এছাড়া অসামরিক রোগীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দিন কয়েকের মধ্যে রুলার্সেই অসামরিক হাসপাতাল খোলা হলো একটা।

খবরটা পৌঁছে দিলাম তেষট্টি নম্বরের হাতে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এত তোড়জোড়, হাঁকডাক, নতুন হাসপাতালের ব্যবস্থা কিসের জন্যে? কোন নতুন সৈন্য আসছে না, যুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির কোন খবরও শুনিনি। তাহলে? ভেবে ভেবে গরম হয়ে গেল মাথা। কিন্তু কিছুতেই কিছু উদ্ধার করতে পারলাম না।

তারিখটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। তেইশে এপ্রিল, উনিশ শো পনেরো। বাসায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ খটখট শব্দ শুরু হলো দরজায়। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। দেখি, হাসপাতাল থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসেছে। জরুরী তলব, এক্ষুণি যেতে হবে। দ্রুত পোশাক পাল্টে রওনা দিলাম। ভেবেই পেলাম না, কী এমন হলো! হাসপাতালে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যেই হাত-পা জমে গেল আমার। মনে হলো, গলার কাছটা মুচড়ে ধরেছে কেউ। এক বিন্দু নির্মল বাতাসের জন্যে আকুলিবিকুলি করে উঠল বুকের ভেতরটা। টলতে টলতে এগোলাম সামনে।

হাসপাতাল ভর্তি ফরাসী বন্দী। আরও আসছে। দলে দলে, হাজারে হাজারে। যতদূর দেখা যায় শুধু ফরাসী বন্দীর মিছিল। হাত-মুখ ফুলে ঢোল। ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে। গ্যাস আক্রমণ চালিয়েছে জার্মানরা। এক মুহূর্তে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ক্লোরিন সিলিন্ডার, বাতাসের গতিবিধি আর কেমিস্ট্রির

অধ্যাপকের রহস্য।

অসহ্য ক্রোধে নিজের হাতই কামড়াতে ইচ্ছে করল আমার। এতবার করে খবর দিলাম, বুঝলই না ব্যাপারটা? আবার লিখল, গুরুত্বপূর্ণ খবর দেবার জন্যে!

www.shopnil.com

সাত

একঘেয়েভাবে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। হাসপাতালে যাই। বাড়ি ফিরি। খাই-দাই। ঘুমাই। বাস, এর বাইরে আর কোন কাজ নেই।

হাত-পায়ে মরচে ধরার আগেই ক্যান্টিন মা-র হাতে খবর পেলাম। খুশি হয়ে উঠলাম অনেকদিন পরে খবর আসায়। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পড়লাম, 'আমাদের বহু খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। জার্মান বন্দীদের কাছ থেকে জানা গেছে, বার্জ জেলার রাদারব্রুকের কাছাকাছি কোথাও জার্মানদের গোপন টেলিফোন লাইন আছে একটা। বৃটিশ টেলিফোন লাইনের সাথে যোগাযোগ আছে এর। বহু চেষ্টাতেও জায়গাটার খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনি খোঁজ করুন।'

খবরটা পেয়ে যাও বা একটু খুশি হয়ে উঠেছিলাম, পড়ে হতাশ হয়ে গেলাম। রাদারব্রুক এখান থেকে কমপক্ষে বিশ মাইল। এখানে বসে খোঁজ খবর নেব কি করে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ল কথাটা। পাওয়া গেছে একটা ছুতো। আমার কাকা থাকেন ওখানে। এখন কোনভাবে ছুটি এবং রাদারব্রুক যাবার পাস জোগাড় করতে হবে।

দিন দু'য়েকের মধ্যেই জুটে গেল ছুতো। গুজব রটল, সব অসামরিক লোকজনকে রুনার্স ছাড়তে হবে। সাথে সাথে ঠিক করলাম, সুযোগটা কাজে লাগাব।

আমাদের কাফের সেই কেমিস্ট ভদ্রলোক গ্যাস আক্রমণের পর পরই চলে গেছে। তারপর থেকে জার্মান মেশিনগান কোম্পানির কমান্ডার ফ্যাসুজেল আছে ও রুমে।

ফ্যাসুজেলকে হাসপাতালে থাকতেই চিনতাম। মারাত্মক আহত অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে ছিল অনেকদিন। কাফেতে আসার পর থেকে আরও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছে। খুব ভাল ব্যবহার করে আমার সাথে।

গুজবটা শোনার পর সোজা চলে গেলাম ওর কাছে। এ-কথা ও-কথার পর বললাম, 'যে রকম কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি তাতে এখানে আমাদের থাকা বোধহয় আর হচ্ছে না।'

'না, না, কি যে বলেন,' কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল ফ্যাসুজেল, 'সব গুজব।'

বললাম, 'তা না হয় হলো। কিন্তু ধরুন, সত্যি সত্যি যদি কোনদিন চলে যেতে হয় তাহলে এত জিনিস-পত্র নিয়ে অবস্থাটা কি হবে? ভাবছি, রাদারব্রুকে আমার কাকা আছে, তার কাছে কিছু জিনিস-পত্র রেখে আসি।' হেসে বললাম, 'তাই আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে আপনার।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল ফ্যাসুজেল। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলাম ওর মুখের দিকে। ধুকধুক করছে বুকের মধ্যে। ওর সাহায্য পেতেই হবে। কারণ যাতায়াতের ব্যাপারে জার্মান মেশিনগান কোম্পানির মত স্বাধীনতা আর কেউ পায় না।

মুখ খুলল ফ্যাসুজেল, 'দিন দু'য়েকের জন্যে আপনাকে একটা ওয়াগন দেয়া যায়। এক কাজ করুন। যে জিনিস-পত্রগুলো পাঠাতে চান, সেগুলো পেছনের ঘরে

রেখে দিন। আমি কালকে সন্ধ্যার পরে ওগুলো ওয়াগনে উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, ভাল কথা, কোথায় পৌছে দিতে হবে?'

কথাটা আগেই ভেবে রেখেছি আমি। মুখে লজ্জিত একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'ঠিকানা তো জানি না, বাসা চিনি শুধু। তবে কাকার নাম বললে সবাই চিনবে ওখানে।'

'এহ, বিপদে ফেললেন একেবারে। জার্মান মেশিনগান কোম্পানির ওয়াগন ড্রাইভার কোন বেলজিয়ামের খোঁজ করছে দেখলে অবস্থাটা কি হবে, ভেবে দেখেছেন? তাছাড়া আপনার কাকাকেও সন্দেহ করবে অনেকে। সবচেয়ে বড় কথা, এভাবে ওয়াগন দেয়াটাই বে-আইনী। তারপর মাল-পত্র সুদ্ধ ধরা পড়লে চাকরি যাওয়া তো সাধারণ কথা, কোর্ট মার্শালই হয়ে যায় কিনা, কে জানে।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'তাইতো, খুব ঝামেলায় ফেলে দিলাম।' তারপরই যেন মনে পড়েছে কথাটা, এমনভাবে তাড়াতাড়ি বললাম, 'এক কাজ করলে কেমন হয়, আমি যাই সাথে?'

'ভালই হত, যদি ছেলে হতেন আপনি।'

'ছেলের পোশাকে যাই তাহলে?'

হেসে ফেলল ফ্যাসুজেল, 'তা হয় অবশ্য। তা-ই করুন। আপনি রেডি হয়ে থাকবেন। আমি পোশাক, হেলমেট আর একটা পাইপ পাঠিয়ে দেব। চুল ঢাকা থাকবে হেলমেটে। মুখে পাইপ থাকলে কেউ ধরতেই পারবে না আপনি মেয়ে। ভাল কথা, যে ড্রাইভারকে পাঠাব, তার নাম সাইলেন্ট উইলী। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন ওকে।' শেষের কথাটা বলে একটু হাসল ফ্যাসুজেল। বুঝলাম, কথাটা কেন বলল ও। ওয়েস্ট রুজবেকের সেই ঘটনা মনে পড়লে দম বন্ধ হয়ে আসে এখনও।

কথামত পরদিন সন্ধ্যায় এল ওয়াগনটা। রেডি হয়েই ছিলাম। গাড়ির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোলাম। দরজা খুলে নামল সাইলেন্ট উইলী। একটা কাপড়ের বান্ডিল আর হেলমেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কমান্ডার দিয়েছেন।'

বান্ডিলটা নিয়ে শোবার ঘরে এলাম। খুলে দেখি, দরকারী সবকিছুই আছে। পোশাক পাল্টানো শুরু করলাম। ট্রাউজার, হেলমেট, বুট সবকিছুই ঠিকঠাক লেগে গেল। গোলমাল পাকাল টিউনিক। কিছুতেই পড়তে পারি না। কারণ ওগুলো তো আর আমার বুকের মাপে তৈরি হয়নি! শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খুলল। ব্যান্ডেজের মত জড়িয়ে নিলাম বুকে। তার ওপর গ্রেটকোট চাপাতেই ঠিক হয়ে গেল সব। এসব পরে কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, খুব শখ হলো দেখার। কিন্তু মুশকিল হলো, ঘরে তেমন আয়না নেই। কাফেতে আছে কিন্তু এই পোশাকে তো আর যাওয়া যায় না! ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সাইলেন্ট উইলী এর মধ্যেই বেশির ভাগ জিনিসপত্র তুলে ফেলেছে ওয়াগনে। বাকিটুকু দু'জনে মিলে ধরাধরি করে তুলে ফেললাম। উঠে বসতেই ছেড়ে দিল ওয়াগন।

মিনিট বিশেক একভাবে চলার পর মেইন রোড থেকে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় নেমে পড়ল ওয়াগন। যেতে যেতে সাইলেন্ট উইলী নামকরণের কারণটা বুঝলাম। সেই যে পোশাকগুলো দেবার সময় কথা বলেছিল একবার, তারপর থেকে একেবারে বোবা হয়ে আছে।

কিছুদূর যাবার পর চোখে পড়ল মিলিটারি পুলিস। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামাতে বলছে। থামল না সাইলেন্ট উইলী। গতিটা কমাল শুধু। কাছে আসতেই চিৎকার করে উঠল, 'বাহান্ন নম্বর মেশিনগান কোম্পানি।' সাথে সাথে হাত দেখিয়ে যাবার নির্দেশ দিল ওরা। বুঝলাম, মেশিনগান কোম্পানি নামের ওজন কেমন!

আধঘন্টা ধরে চলছি। রাস্তা আগের মতই। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছি। এর মধ্যে বার তিনেক থামতে বলা হয়েছিল। সাইলেন্ট উইনী প্রত্যেকবার একইভাবে পার হয়ে এসেছে।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ নীল ইউনিফর্ম পরা দু'জন নৌ-সেনা রাস্তার মাঝখানে গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাবার হুকুম দিচ্ছে। এবারে না থামিয়ে আর উপায় থাকল না। ইশারায় চুপচাপ থাকতে বলে ঝট করে কোমর থেকে রিভলভার বের করল সাইলেন্ট উইনী। জানালা দিয়ে রিভলভার নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে উঠল, 'কানা নাকি? চোখে পড়ে না, এটা বাহান্ন নম্বর মেশিনগান কোম্পানির ওয়াগন? এখানে কি দরকার তোমাদের?'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল দু'জন। আমতা আমতা করে বলতে শুরু করল, 'না, মানে, এমনি···মানে, সিগারেট আছে? মানে, সিগারেট খাবেন?'

'ভাগো, রাস্তা ছাড়ো!' ধমক লাগাল সাইলেন্ট উইনী। লাফিয়ে সরে গেল ওরা। আবার ছুটল ওয়াগন। তার আগে অবশ্য নৌ-সেনাদের বাড়িয়ে দেয়া সিগারেটের প্যাকেট দুটো নিয়ে নিতে ভুল হয়নি উইনীর।

ভোরবেলা পৌঁছোলাম কাকার বাসায়। মর্নিং ওয়াক সেরে মাত্র ফিরেছে কাকা। ওয়াগন দেখে থমকে দাঁড়াল। দু'জন জার্মান সৈনিককে নামতে দেখে ভয় পেয়ে গেল কাকু। এগিয়ে গেলাম আমি। কাছে গিয়ে দেখি, রক্ত সরে গেছে তার মুখ থেকে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে চিনতেই পারল না কাকু। হেলমেট খুলতেই ঝাঁপিয়ে নামল আমার লম্বা চুল। অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল কাকু। হেসে বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছ না, কাকু? আমি মার্থা।'

হাঁ-টা আরেকটু বড় হলো। হেসে কাকুর হাত ধরে টান দিলাম। বললাম, 'ভেতরে চলো, কাকু।'

সংবিৎ ফিরল কাকুর। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'চল, চল, ভেতরে চল। একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি!' সাইলেন্ট উইনীর দিকে ফিরে বলল, 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

সকাল আর দুপুরে রাজকীয় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করল কাকু আর কাকীমণি। এতদিন পরে এসেছি, সাথে আবার মেহমান। আমি অল্পস্বল্পই খেলাম। পেট ফাটিয়ে খেলো সাইলেন্ট উইনী। ওকে বিশ্রামের জন্য গেস্টরুমে পৌঁছে দিয়ে বললাম, 'আপনি বিশ্রাম নিন। আমি ঘন্টাখানেক পরে একটু ঘুরতে বেরোব। পরিচিত লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আসি। আবার কবে আসা হয়, কে জানে।'

'আমি নড়ছি না এখান থেকে,' বলে পাশ ফিরে শুলো ও। হেসে বেরিয়ে এলাম। বুঝলাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত মড়ার মত ঘুমোবে ও। এমন বিশ্রামের সুযোগ তো আর সব সময় পাওয়া যায় না!

কাকুর সাথে গল্প জুড়লাম। গল্পের ফাঁকে খোঁজখবর নিলাম আশপাশের। কাকু জানাল, ডকের কাছে ছোট্ট একটা বনভূমি আছে। সাধারণ মানুষের যাবার নিয়ম নেই ওখানে। ডকে সাবমেরিন অ্যাসেম্বলি আছে একটা। কয়েকদিন ধরে সমানে গোলাবারুদ জমা করা হচ্ছে ওখানে।

সবচেয়ে দামী যে খবরটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, সেটাই শুনলাম সবার শেষে। মেইন রোড থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়ের দিকে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগোলেই হাতের বাম পাশে পড়ে মাঠ। মাঠের পরে জঙ্গল। জঙ্গলের শুরুতেই কাঠের ছোট্ট কুটির আছে একটা। ওখানে চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করে দু'জন জার্মান সৈনিক। কিসের ডিউটি, তা ওরাই জানে। তবে দু'জনকে একসাথে কখনও

বের হতে দেখেনি কেউ।

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। যা খুঁজছিলাম, এত সহজে পেয়ে যাব, ভাবতেই পারিনি।

একটু ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, কাকুর সাহায্য লাগবেই। বললাম, 'আমি ওখানে একটু যাব, কাকু।'

চোখ কপালে উঠল কাকুর। বলল, 'পাগল না মাথা খারাপ তোর? সেধে বিপদ ডেকে আনতে যাবি? ওখানে তোর কি দরকার?'

'যা-ই হোক না কেন, কাকু, আমাকে যেতেই হবে ওখানে।'

'বললেই যেতে দিচ্ছি আর কি! খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, ওখানে যাবে। তোর কিছু হলে তোর বাবা-মা'কে কি বলব?'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, কাকু। যা বলার আমিই বলব। আমাকে যেতেই হবে ওখানে।'

কিছুক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কাকা। বুঝল সব। আস্তে করে বলল, 'বড়ো ভয়ঙ্কর কাজ নিয়েছ, মার্থা। প্রার্থনা করি, সফল হও তুমি।'

'তাহলে একটু সাহায্য করো, কাকু।'

'কি করতে হবে?'

'বিশেষ কিছু নয়। খানিকটা তুলো, ব্যান্ডেজ আর একটা আই-শিল্ড জোগাড় করে দাও।'

'বেশ, এনে দিচ্ছি।'

বেরিয়ে গেল কাকা। আধঘন্টার মধ্যেই এসে গেল জিনিসগুলো।

সাজতে বসে গেলাম। চোখে আই-শিল্ড আর মুখে ব্যান্ডেজ তুলো বেঁধে মিনিট বিশেকের মধ্যেই রোগী বনে গেলাম। কোটের পকেটে রুলার্স হাসপাতাল থেকে আনা ক্লোরোফর্মের শিশি আর তুলোর বান্ডিলের অস্তিত্বটা আরেকবার অনুভব করে নিলাম। কাকার বেড়ানোর লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার অন্ধকার জড়িয়ে ধরল আমাকে।

বনের কাছাকাছি এসে চোখে পড়ল কুটিরটা। আরেকটু এগোতেই দেখলাম, অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মোটাসোটা একজন। লাফ দিয়ে চড়ে বসল ঘোড়ায়। খটখট করতে করতে চলে গেল পাশ দিয়ে। তাকালই না আমার দিকে। স্বস্তি পেলাম।

একেবারে কাছে চলে গেলাম কুটিরের। খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল একটা কাঠের টেবিল। ওর ওপর টেলিফোন রাখা। টেবিলের ওপাশে বুড়ো মত সৈনিক। মুখে পাইপ গুঁজে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ঢুকে পড়লাম ঘরে। খেঁকিয়ে উঠল সৈনিকটা, 'এই হারামজাদা! এখানে কি চাস? বেরো, বেরো এখান থেকে।'

ছোটবেলায় দেখা বোবা ফকিরের অভিনয়টা নিখুঁতই হলো। টেবিলের ওপর রাখা কাগজ-কলম দেখিয়ে ইশারায় বোঝালাম, লিখতে পারি আমি। হাত বাড়ালাম ওদিকে। কাগজ-কলম এগিয়ে দিল বুড়ো। লিখলাম, 'হাসপাতাল থেকে ঘুরতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া পাইপের তামাকও শেষ হয়ে গেছে। আলো দেখে ভাবলাম, এখানে এলে রাস্তার সন্ধান পাব, তামাকও পাব একটু।'

রোগী দেখে মেজাজ খানিকটা নরম হলো বুড়োর। বসতে বলল। পকেট থেকে তামাকের কৌটো বের করে খানিকটা তামাক এগিয়ে দিল। তামাকটুকু পাইপে ঠেসে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগলাম। ভয় হলো, তামাক ঠাসা আর পাইপ টানার ছিরি দেখে সন্দেহ করে না বসে আবার। বরাত ভাল, বুড়ো খেয়ালই করল না এসব।

খানিকক্ষণ পাইপ টেনে কাগজে লিখলাম, 'এই বনের মধ্যে একা একা আপনি

www.shopnil.com

করেন কি?'

আমাকে বুড়ো আর রোগী ভেবেই বোধহয় পাত্তা দিল না বুড়ো। তাছাড়া চুপচাপ বসে থাকাও বিরক্তিকর। বলল, 'কি করি? বসে বসে টেলিফোন ধরি শুধু।'

লিখলাম, 'কিসের টেলিফোন?'

'গরম খবরের,' হেসে উঠল বুড়ো, 'বিশ্বাস করবে নাকি যে এই টেলিফোনের অন্য মাথা আছে বৃটিশ ফ্রন্ট লাইনের পেছনে এক পাদ্রীর বাড়িতে! কি, বিশ্বাস হয়?'

চোখেমুখে প্রচণ্ড অবাক ভাব নিয়ে লিখলাম, 'হওয়া খুব কষ্টকর। কিন্তু একা একা খবর পাঠান কি করে? আর আপনি বাইরে গেলে টেলিফোন ধরে কে?'

'আরে, একা তো এখন। আরেকজন ছিল। এইমাত্র খবর নিয়ে হেডকোয়ার্টারে গেছে। ঘন্টা দু'য়েক পরেই চলে আসবে। এর মধ্যে কোন খবর এলে লিখে রাখব শুধু।'

অনেকটা দুশ্চিন্তা কাটল। দু'ঘন্টা সময় পাওয়া গেল তাহলে। বসে বসে মিনিট দু'য়েকের মধ্যে প্ল্যান করে ফেললাম। বিনয়ে-বিগলিত ধরনের একটা হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিছুদূর গিয়ে ক্লোরোফর্মের শিশিটা বের করলাম। তুলোর বাণ্ডিলটা বেশ করে ভিজিয়ে পকেটে রেখে ফের ঢুকলাম ঘরে। বুড়ো বেশ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ফিরলে কেন আবার?'

লিখলাম, 'হাসপাতালে যাবার রাস্তাটা তো মনে নেই। দয়া করে একটু দেখিয়ে দিলে খুব উপকার হত।'

'ঠিক আছে, চলো।' উঠে দাঁড়াল সৈনিকটা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওর পেছনে পেছনে দু'পা এগোলাম, তারপর লাঠিটা তুললাম। সর্বশক্তি দিয়ে মারলাম মাথায়। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল বুড়ো। সাথে সাথে ক্লোরোফর্ম ভর্তি তুলো ঠেসে ধরলাম নাকে। আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরলাম মুখ। দশ-পনেরো সেকেণ্ড পরেই এলিয়ে পড়ল। টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম ওকে। টেবিলের চাদরটা ছিঁড়ে কষে হাত পা বাঁধলাম। তারপর মুখে তুলো গুঁজে দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম চেয়ারে বসে। একটু সুস্থির হয়ে ঘড়ি দেখলাম। দশ মিনিট গেছে মাত্র। এখনও প্রচুর সময় আছে।

বার দু'য়েক টেলিফোনের রিসিভার কানে তুললাম। নাহ্, কোন সাড়াশব্দ নেই। রেখে দিলাম। থাক। ওপাশ থেকে কেউ করলেই বরং ভাল হবে। বসে বসে ঝিমোতে লাগলাম। একটু পর পরই ঘড়ি দেখছি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। আর কতক্ষণ? অন্য লোকটা এসে পড়লেই তো শেষ আমি।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। চলে যাবার জন্যে লাঠিটা তুলতেই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। এতই চমকে উঠলাম যে হাত থেকে পড়ে গেল লাঠি। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম টেলিফোনের ওপর। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে, তবু রিসিভার তুলে গলাটা যথাসম্ভব বিকৃত করে বললাম, 'লাইনে আছি। খবর বলুন।'

'কে আপনি,' ভয় এবং সন্দেহ মাখা গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে, 'আপনার গলা তো আগে শুনিনি কখনও!'

'ঠিকই ধরেছেন, আমি নতুন লোক। একটু আগে বোমা পড়ে পুরানো ঘাঁটিটা মাটির সাথে মিশে গেছে। আগের দু'জনের একজন মারা গেছে, আরেকজন হাসপাতালে। আমরা অস্থায়ীভাবে লাইনটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়েছি। আমি একজন অফিসার। আমার কথাগুলো নোট করে নিন তাড়াতাড়ি।'

'বলুন।'

'ইংরেজরা আপনাদের লাইনের খোঁজ পেয়ে গেছে। এখনই ওখান থেকে

লাইন কেটে নিয়ে সরে যান আপনারা। দেরি হলেই ধরা পড়ে যাবেন। পরে
সুযোগ-সুবিধে মত অন্য কোথাও থেকে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবেন।'
আতঙ্কিত স্বর ভেসে এল ওপাশ থেকে, 'সর্বনাশ! জানল কি করে? হাতে সময়
আছে তো?'
বললাম, 'ভয় পাবেন না। আগে বলুন, লাইনটা কোথায় সরানো যায়।
দরকার পড়লে প্যারাট্রুপার পাঠানো যাবে। আপনার সামনে ম্যাপ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভাল কথা। এবার ম্যাপ দেখে বলুন, কোত্থেকে লাইন নিলে সুবিধে
হবে।'
মিনিটখানেক চুপচাপ থাকল ওপাশের লোকটা। অস্থির হয়ে উঠলাম। এখন
এক একটা মিনিটই প্রচণ্ড মূল্যবান। অধৈর্য হয়ে তাড়া দেবার আগেই উত্তর এসে
গেল। নোটবইয়ে জায়গাটার নাম লিখে নিলাম। অপরিচিত জায়গা। ম্যাপ দেখে
বের করে ফেলব সময়মত। বললাম, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে।' বিদায় জানিয়ে
নামিয়ে রাখলাম টেলিফোন।
মেঝে থেকে লাঠিটা তুলে নেবার সময় দেখি, জ্ঞান ফিরে এসেছে বুড়োর।
বাঁধন খোলার জন্যে ছটফট করছে। হেসে বললাম, 'তামাকটা কিন্তু ভালই ছিল।
বেশ ভাল। অনেক ধন্যবাদ।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরলাম প্রায় দশটায়। চারপাশ ভালমত দেখে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির পেছনে
চলে গেলাম। কথামত খোলাই ছিল দরজা। রুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি তুলো ব্যাণ্ডেজ
খুলে পুড়িয়ে ফেললাম। হাতমুখ ভাল করে ধুয়ে পোশাক পাল্টে গেলাম সাইলেন্ট
উইলীর খোঁজে। দেখি খোশমেজাজে আছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

আঁতকে উঠল ও, 'এই পোশাকে?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'তাইতো, একেবারেই খেয়াল ছিল না। আপনাকে বিপদে ফেললাম না তো?'

'কে জানে।'

পর মুহূর্তেই বললাম, 'কিন্তু এ ছাড়া তো পোশাকও ছিল না আমার।'

কোন উত্তর দিল না ও।

কাকা ঘরে ঢুকে বলল, 'খাবার দেয়া হয়েছে। এসো তোমরা!'
খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি, বিরাট ব্যাপার। মহাভোজের ব্যবস্থা করেছে
কাকা। সাইলেন্ট উইলীর দাঁত বেরিয়ে গেছে খাবারের পদ আর পরিমাণ দেখে।
পেট ফাটিয়ে খেলাম আমরা। সাইলেন্ট উইলী পারলে কিছু বেঁধে নিয়ে যায়,
এরকম অবস্থা। ভদ্রতা করেই বোধহয় নিল না।

'আসি, কাকু,' ওয়াগনে উঠতে উঠতে বললাম, 'আবার দেখা হবে। যাই, কাকীমণি।'

'দাঁড়া, দাঁড়া,' ব্যস্ত হয়ে উঠল কাকা, 'কইরে, কোথায় গেল।' বলে নিজেই ছুটল ঘরে। একটু পরেই কয়েক শিশি জ্যাম জেলি নিয়ে বেরিয়ে এল। সাইলেন্ট উইলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু তো করতে পারলাম না। সামান্য কিছু জ্যাম দিলাম আপনার জন্যে।'

'ধন্যবাদ,' হাসিমুখে বলল সাইলেন্ট উইলী। লাফিয়ে উঠল ওয়াগনে। ছেড়ে দিল ওয়াগন।

ভোরবেলা পৌঁছোলাম বাড়িতে। রাস্তায় কোন অসুবিধেই হয়নি।
সারাদিন ছটফট করে কাটল। কখন খবরটা পাঠাব। সন্ধ্যা নামতেই

www.shopnil.com

বেরোলাম। নির্বিঘ্নে খবরটা পৌঁছে দিলাম তেষট্টি নম্বরের হাতে।

দিন কয়েক খুব দুশ্চিন্তায় কাটল। কাকার জন্যেই যত চিন্তা। কোন ভাবে যদি আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়, কাকার যে কি হবে, ভাবতেই শিউরে ওঠে শরীর।

সপ্তাহ খানেক পর। ভোরবেলা ডিউটি পড়েছে। হাসপাতালে পৌঁছোতেই একজন ড্রেসার এগিয়ে এল, 'হের ওবার্তাজ আপনার খোঁজ করেছিলেন। বলে গেছেন, আপনি এলেই যেন দেখা করেন ওঁর সাথে।'

থরথর করে কেঁপে উঠল সারা শরীর। গেছি! ধরা পড়ে গেছি আমি! ধপ করে বসে পড়লাম। ভাগ্যিস ড্রেসারটা নেই। বেশ খানিকক্ষণ পরে কাঁপুনি কমল কিছুটা। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম। কি হতে পারে? যা ভাবছি তা না-ও তো হতে পারে! দূর, যা হয়, হবে। যাই তো আগে।

ওবার্তাজের রুমের দিকে পা বাড়াতেই কাঁপুনিটা ফিরে এল আবার। কোনরকমে ভেতরে ঢুকলাম। ভুল। কোন আশা নেই। টাউন কমান্ড্যান্ট বসে আছে ভেতরে। শেষ বিচারের রায় শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে কুলকুল করে ঘামতে লাগলাম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ওবার্তাজ। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস, ফ্রাউলিন। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। টাউন কমান্ড্যান্টও এসেছেন তোমাকে অভিনন্দন জানাতে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওবার্তাজের দিকে। কোন মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কথার। ওবার্তাজের কথাগুলো যেন অন্য জগত থেকে ভেসে এল, 'মহান সম্রাট তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে জার্মান মেডিকেল সার্ভিসের সর্বোচ্চ সম্মান "জার্মান আয়রন ক্রস" দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করেছেন।'

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে খানিকটা সময় লাগল আমার। তারপরেই বেরিয়ে এল হাসি। বাঁধভাঙা বন্যার মত। খুশির এবং মুক্তির। হিস্টিরিয়ার রোগীর মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শরীর। চোখের জলে ভিজে গেল গাল। টাউন কমান্ড্যান্ট আর ওবার্তাজের হাসিমাখা অবাক দৃষ্টির সামনে ধপ করে বসে পড়লাম চেয়ারে।

বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যায়। ক্যান্টিন-মা-র দেয়া চিরকুটটা দিয়ে গেল মা। লেখা আছে, 'অত্যন্ত মূল্যবান খবরের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আজকের দিনটা বেশ ভালই গেল।

আট

গরম পড়ে গেছে। সেই সাথে মিত্রপক্ষের বিমান হামলাও কমে গেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্লেন আসে। ভাবখানা যেন, আমাদেরও ফাইটার প্লেন আছে। দু'চারটা গোলা ছোঁড়ে। বেশির ভাগই ফাটে আকাশে। মাটিতে ফাটলেও ক্ষয়ক্ষতি হয় না বললেই চলে। আজকাল ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোও ছেড়ে দিয়েছে সবাই।

একদিন খেয়াল করলাম, প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জার্মানরা। চারদিকে সাজানো গোছানো ধোয়া-মোছার ধুম পড়ে গেছে। নতুন পোশাক পরে ঝকঝকে চকচকে রাইফেল নিয়ে ঘুরছে জার্মান সৈনিক।

হাসপাতালের ময়লা চাদর, বালিশের ওয়ার, মশারি সব ধোলাই করে ধবধবে করার জন্যে পাঠানো হলো। ওয়ার্ড, কেবিন, অপারেশন থিয়েটার একেবারে ঝকঝকে হয়ে উঠল। কারণটা বুঝলাম না। কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'জানি

না, কেন। হুকুম হয়েছে, করেছি। ব্যস।'

খোঁজ করলাম অনেক। ফলাফল শূন্য। একদিন ডিউটি সেরে রুমে বসে আছি, এলফস এল। চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কাইজার আসছে, এখানেও আসবে।'

সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে গেল সব।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। দেখুন তো, আসার তারিখটা বের করতে পারেন কিনা।'

'অবশ্যই। চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

'আচ্ছা, আসি তাহলে,' চলে গেল এলফস। আমাকে কঠিন একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে।

কাইজার। জার্মানদের মহান সম্রাট কাইজার। এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত, মনুষ্যত্বের এত অবমাননা যার জন্যে, সেই কাইজার আসছে। রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠল। কাইজার না থাকলে যুদ্ধও হয়তো থাকবে না। আবার মুক্ত হবে বেলজিয়াম। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল শরীর। শুধু খবরটা যদি পাঠাতে পারি সময়মত।

দিন-দুই পরে ক্যান্টিন-মা দিয়ে গেল একটা চিরকুট। লেখা আছে, 'কাইজার আসার তারিখ এবং সময় জানলে বৃটিশ এয়ারক্র্যাফট যাবে।'

চিরকুটটা পেয়ে নাওয়া-খাওয়া শিকেয় উঠল আমার। যে করেই হোক, বের করতে হবে খবরটা। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কিচ্ছু হলো না। হতাশ হয়ে পড়লাম।

এর মধ্যে প্রচুর উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসারে ভরে গেছে রুলার্স। পরনে চকচকে পোশাক। খাস মিলিটারি মেজাজ। সবার দিকে এমন চোখে তাকায় যেন কষে ধমক লাগাবে এক্ষুণি। দেখে হয় মনে সবকটা ঘেয়ো কুকুর। লেজে পোকার কামড়ে অস্থির হয়ে আছে।

একদিন সকালে হাসপাতালে কাজ করছি, একজন এসে খবর দিল, ওবার্তাজ ডেকেছেন। আজকাল ভয় অনেকটা কমে গেছে আমার। ধরেই নিয়েছি, যা হয়, হবে। শুধু শুধু ভয়ে আধমরা হয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

ওবার্তাজের রুমে ঢুকে দেখি, নতুন মুখ। পোশাক দেখে বুঝলাম, কর্নেল। ওবার্তাজ বললেন, 'হের কর্নেলকে হাসপাতালটা ঘুরিয়ে দেখাও তো, ফ্রাউলিন।'

'চলুন,' বললাম আমি।

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। বেরিয়ে এল আমার সাথে।

হাসপাতালের সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখালাম কর্নেলকে। একটা ফাঁকা-মত জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে পড়ল কর্নেল। আমাকেও থামতে হলো। আমি তাকাতেই কর্নেল বলল, 'কালকে আমার সাথে লাঞ্চ খেলে খুব খুশি হব, ফ্রাউলিন।'

বললাম, 'আমার পরম সৌভাগ্য, হের কর্নেল।'

খুশিতে গদগদ হয়ে গেল কর্নেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আরেকটা অনুরোধ করতে চাই আপনাকে। বলুন, রাখবেন?'

'সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব। বলুন আপনি।'

'আপনার মত শিক্ষিতা আর সুন্দরী মেয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি। কালকে ব্রাসেলসে যাচ্ছি। ওখানে ক'দিন থাকব। আপনার কি দুটো দিন সময় হবে ওখানে যাবার?'

পরিষ্কার বুঝলাম, কি চায় সে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যা হয়, হবে। যাব আমি। কর্নেলের মত হাই র‍্যাঙ্কের অফিসারের কাছ থেকে অনেক দামী

www.shopnil.com

খবর পাওয়া যেতে পারে। কাইজারের আসার সময় আর তারিখ জানার জন্যে যে কোনকিছু করতে রাজি আছি আমি।

কর্নেল অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হেসে বললাম, 'হ্যাঁ। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি, ব্রাসেলসে যাব একবার। যাই-যাই করে যাওয়াই হলো না এখনও। আমার দাদু আছেন ওখানে, গেলে দেখা হত। কিন্তু...।'

গলে গেল কর্নেল। বলল, 'কোন কিন্তু নয়। কাল দশটার মধ্যে পাস পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তারপরই উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন তো?'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' বললাম আমি, 'ও আমি ম্যানেজ করে নেব। আপনার জন্যে এ কাজটুকুও করতে পারব না?'

হাঁটতে হাঁটতে দরজার কাছে চলে এসেছি। গলে যাওয়া কর্নেল হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরল আমার। চুমো দেবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। সাথে সাথে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কি করি আমি! কর্নেলকে নিরাশ করা কি ঠিক হবে এখন? এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল মাথায়। কিন্তু ঈশ্বরই বোধহয় বাঁচালেন আমাকে! বুটের আওয়াজ শোনা গেল, খুব কাছেই। তাড়াতাড়ি গলা ছেড়ে দিল কর্নেল। বেরিয়ে এলাম করিডরে। দু'জন অফিসার বাইরে। কর্নেলকে দেখেই খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকল।

ওরা চলে যেতেই হেসে উঠল কর্নেল, 'ঠিক আছে। পাওনা থাকল। কালকে দশটার মধ্যে পাস পেয়ে যাবেন। চলি। আবার দেখা হবে। ব্রাসেলসে।'

যাবার আগে একটা চোখ একটু ছোট করে হাসল কর্নেল। রহস্যময় হাসিতে তার উত্তর দিলাম।

কর্নেল চলে যাবার পর প্রথমেই মনে হলো, কাজটা কি ঠিক করলাম? ভাবলাম অনেকক্ষণ। ভেবে দেখলাম, এ-ছাড়া হয়তো উপায়ও ছিল না। 'না' বললে অন্যভাবে বিপদে ফেলতে পারত কর্নেল। তাছাড়া রাজি হয়ে গেছি আমি। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই এখন।

পরদিন দশটার মধ্যেই পাস পৌঁছুল। সেই সাথে লাঞ্চের আমন্ত্রণ। গেলাম। লাঞ্চ খেতে খেতে শুনলাম কর্নেলের মধুমাখা কথাবার্তা।

'যাওয়াটা একদিন পিছিয়ে গেল, ফ্রাউলিন। কাল সকালে যাচ্ছি। আপনি পরশু সকালে রওনা দিন। এর মধ্যে হাতের কাজগুলো সেরে রাখব। ভাল কথা, আজকে ডিনারে কি আপনার সঙ্গ পেতে পারি?'

বললাম, 'পারলে আমিও খুব খুশি হতাম। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পরে ডিউটি আমার। কি বিশ্রী অবস্থা হলো, দেখুন তো!'

'ঠিক আছে, এটাও পাওনা থাকল,' অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল কর্নেল।

ট্রেন ছুটছে দুলকি চালে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে আসছে মাঠ, ফসলের খেত, ডোবা, গাছপালা, মানুষ। দ্রুত সরে যাচ্ছে আবার।

ব্রাসেলস যাচ্ছি। তিন দিনের ছুটি নিয়েছি। অসুবিধে হয়নি কোন।

ট্রেনের দুলুনিতে দিব্যি ঝিমানো ভাব এসে গেছে। তার মধ্যেই চক্কর দিচ্ছে চিন্তাটা। কাজটা ঠিক করলাম তো?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্টেশনে গাড়ি ঢোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। এসে গেছে ব্রাসেলস। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নেমে পড়লাম।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। নেই কর্নেল। অথচ আসার কথা ছিল তার। কি হলো, ভাবছি, এ সময় একজন শোফার এগিয়ে এল আমার দিকে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই মার্থা নোকার্ট, ফ্রাউলিন?'

'হ্যাঁ।'

'কর্নেল পাঠিয়েছেন,' একটা চিঠি এগিয়ে দিল শোফার, 'হঠাৎ জরুরী কাজে আটকে যাওয়ায় নিজে আসতে পারলেন না।'

খুললাম চিঠিটা, 'হঠাৎ বিশেষ কাজে আটকে গেছি। অনেকটা সময় আপনার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়, তার ব্যবস্থা করব। গাড়ি পাঠালাম। শোফারের সাথে চলে আসবেন। কাল সকালে দেখা হবে।'

'চলো,' চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে বললাম।

শোফারের পেছনে পেছনে এগোলাম। বিরাট একটা গাড়ির দরজা খুলে ধরল ও। উঠলাম। দরজা বন্ধ করে গাড়িতে উঠে বসল শোফার। মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হলো গাড়ি।

কোথায় যাচ্ছি আমি? এরপর কি হবে?তবে কি সযত্নে সঙ্গোপনে সাজিয়ে রাখা আমার অনাঘ্রাতা কুসুম ঘৃণ্য পশুর কাছে বিসর্জন দিতে হবে?

ছুটে চলেছে গাড়ি। তার চেয়ে দ্রুত ছুটছে মন। কি হবে? কি হবে?

কাইজার। জার্মানীর মহান সম্রাট কাইজার। কোনদিন চোখেও দেখিনি তাকে। কিন্তু জীবনে আর কাউকে অত ঘৃণাও করিনি। মানুষের এত দুঃখ-কষ্টের মূলে এই কাইজার। তার ধ্বংসের জন্যে যদি আমার শত লাঞ্ছনাও সইতে হয়, হোক। আমার একার লাঞ্ছনায় যদি লক্ষ কোটি লোকের উপকার হয়, সেই তো আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠলাম। সাহস আর আত্মবিশ্বাসও ফিরে এল সাথে সাথে।

ব্রাসেলসের সবচেয়ে নামকরা হোটেলের লবিতে ঢুকল গাড়ি। থামতেই ছুটে এল উর্দি পরা ডোরম্যান। দরজা খুলে ধরল। নেমে ভেতরে গেলাম। ব্যাগ নিয়ে পিছু পিছু এল বেলবয়।

আগে থেকেই ঠিকঠাক ছিল সব। কাউন্টারের লোকটা আমার পেছনে শোফারকে দেখেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল। নিজে পৌঁছে দিল কামরায়।

ব্যাগটা রেখে ওরা বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। মস্তবড় নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা যাবে এবার।

একটু পরে নজর দিলাম কামরার চারদিকে। ট্যারা হয়ে গেল চোখ। অপূর্ব সব আসবাবপত্র। অসম্ভব নরম গদি, বকের চেয়ে ধবধবে সাদা চাদর, পালকের মত মসৃণ। নিজের সামর্থ্যে জীবনেও থাকা হত না এখানে।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কাল সকাল পর্যন্ত অন্তত নিশ্চিন্ত। অনভ্যস্ত বিলাসিতায় ঘুম আসতে দেরি হলো কিছুটা।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মুখহাত ধুয়ে পোশাক পাল্টে নিলাম। এমন সময় নক হলো দরজায়। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কর্নেল নয়তো? কাঁপাকাঁপা হাতে সামান্য একটু ফাঁক করলাম দরজা। নাহ্, বেয়ারা। হাতে ট্রে। এবার পুরোপুরি খুললাম দরজাটা।

'আপনার চিঠি, ম্যাডাম।'

ট্রে-র ওপরে রাখা চমৎকার নীল রঙের এনভেলাপটা তুলে নিলাম। চলে গেল বেয়ারা। দরজা বন্ধ করে এনভেলাপটা খুললাম। ধবধবে সাদা কাগজে লেখা, 'নিচে ডাইনিং হলে অপেক্ষা করছি।'

কোনরকমে চুল আঁচড়ে নিচে নেমে এলাম। ডাইনিং হলে ঢুকতেই কোণের একটা টেবিল থেকে উঠে এল কর্নেল, 'গুডমর্নিং, ফ্রাউলিন। কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'গুডমর্নিং, কর্নেল। কোন অসুবিধে হয়নি আমার। খুব ভাল ছিলাম।'

কর্নেল আমার হাত ধরে নিয়ে গেল কোণের টেবিলে। নাশতার ফাঁকে ফাঁকে

www.shopnil.com

www.shopnil.com

কাল কি কাজে আটকে গিয়েছিল তার ফিরিস্তি দিল। মনোযোগী শ্রোতার মত হাসিমুখে শুনে গেলাম সব।

'উঠি তাহলে,' নাশতা শেষ হতেই বললাম, 'কিছু কেনাকাটা করব ভাবছি। আবার কবে আসা হবে, কে জানে!'

'ঠিক আছে, আপনি কেনাকাটা করতে থাকুন, এই ফাঁকে সামান্য কিছু কাজ সেরে ফেলি আমি। দুপুরে কিন্তু লাঞ্চ খাচ্ছি একসাথে।'

'সে তো বটেই,' হেসে উঠলাম আমি।

রুমে ফিরে ব্যাগ আর কিছু টাকাপয়সা নিয়ে বেরোলাম কেনাকাটা করতে। কাল গাড়িতে আসার সময় অন্যদিকে মনোযোগ দেবার অবস্থা ছিল না। আজকে ভাল করে দেখলাম চারপাশটা। দেখে প্রচণ্ড হতাশ হলাম। এটাই বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস! কি অবস্থা হয়েছে শহরের! কোথায় সেই আয়নার মত চকচকে মসৃণ রাস্তাঘাট, কোথায়ই বা সেই সারি সারি চোখ ঝলসানো দোকানপাট। রো রয়্যাল দেখে থ হয়ে গেলাম। এই সেই বিখ্যাত রো রয়্যাল! খুদে প্যারিস বলা হত যাকে। ভারি মিলিটারি ট্রাক, লরি আর কামানের যাতায়াতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তা। মাঝে মধ্যে বিশাল সব গর্ত। হাঁটতে গিয়ে সামান্য অসতর্ক হলেই হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা।

মিত্রপক্ষের কাছ থেকে দখল করা কামানগুলো ফেলে রাখা হয়েছে এদিক ওদিক। লোকজনের কাছে নিজেদের বীরত্ব জাহির করার জন্যে।

হাঁটছিলাম আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলাম কেবল। মনে হচ্ছিল, বিধবার বেশ পরেছে বেলজিয়াম। বড় বড় দোকানগুলোর শোকেস খাঁ খাঁ করছে, খালি প্যাকেটও নেই। জিনিসপত্র প্রায় পাওয়াই যায় না। যা পাওয়া যায় দাম শুনলে মাথা ঘুরে ওঠে। শেষে এমন অবস্থা হলো যে দামও জিজ্ঞেস করার সাহস রইল না। অনেককিছু কিনব মনে করে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু সামান্য দু'একটা টুকিটাকি জিনিস কিনেই ফিরে এলাম।

ফেরার পথে হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক লোকের একটা মিছিল। সামনে বেয়োনেট লাগানো রাইফেল হাতে জার্মান সৈনিক। থমকে দাঁড়ালাম। কাছে আসতেই বুঝলাম, ইংরেজ যুদ্ধবন্দী ওরা। ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, না খাওয়া শীর্ণ চেহারা। প্রচণ্ড কষ্ট হলো দেখে।

পাশ দিয়ে ট্রাম যাচ্ছিল। ওদের কাছে আসতেই শুরু হলো সিগারেট আর চকোলেট-বৃষ্টি। সব ইংরেজ বন্দীদের জন্যে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। জার্মান সৈনিকদের উপস্থিতিতেও মিত্রপক্ষের প্রতি ভালবাসা অপ্রকাশিত থাকেনি বেলজিয়ানদের।

দুপুরে যথাসময়ে কর্নেল এল। চিঠি পেয়েই নিচে নামলাম। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বকবক শুরু করল কর্নেল।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে এল। মনে হলো, বহু লোক একসাথে কিছু বলছে। আস্তে আস্তে জোরাল হয়ে উঠল আওয়াজ। আরেকটু কাছে আসতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। হাজার হাজার লোকের মিছিল। অসংখ্য গ্যাস-বেলুন উড়ছে আকাশে। গায়ে বেলজিয়াম, ফ্রান্স আর বৃটিশ পতাকা আঁকা। কানে এল, 'বেলজিয়াম দীর্ঘজীবী হোক।'

জল এসে গেল চোখে আনন্দে, বেদনায়। ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ একুশে জুলাই। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা দিবস।

খাওয়া ভুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম ওদিকে। খেয়ালই ছিল না কর্নেলের দিকে। হঠাৎ বাজখাঁই আওয়াজে চমকে উঠলাম। চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কর্নেল। দরজার কাছে দাঁড়ানো সৈনিকদের লক্ষ করে ঘেউ ঘেউ করে

উঠল, 'এই সব মিছিল-ফিছিল বন্ধ করো, গুলি করে ফাটিয়ে দাও বেলুন। শিক্ষা হোক বেজন্মাদের।'

শুরু হয়ে গেল গুলি। প্রচণ্ড শব্দে মনে হলো, যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে জায়গাটা। জানালা দিয়ে দেখলাম, ফাটছে বেলুনগুলো। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মিছিল। আকাশ থেকে একটু একটু করে মুছে গেল বেলুনের মেলা। মন থেকেও মুছল কি?

মিছিল ছত্রভঙ্গ হতেই আমার কথা খেয়াল হলো কর্নেলের। তাড়াতাড়ি ফিরে এল টেবিলে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, ফ্রাউলিন। এসব গোলমাল আমার একেবারেই সহ্য হয় না।'

'না, না, মনে করার কি আছে!'

নিঃশব্দে খেয়ে গেলাম। বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট! অনবরত কথা বলে যাচ্ছে কর্নেল। কিন্তু তার অর্ধেক কথাও কানে ঢুকছে না আমার। হঠাৎ কান খাড়া করলাম। কর্নেল গদগদ হয়ে বলছে, 'আজকে অপেরায় যাব দু'জনে। গালা নাইট আছে। তাছাড়া অল হাইয়েস্ট আসছেন আজ।'

একনিমেষে শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে উঠে এল আমার। কর্নেল খেয়াল করল কিনা কে জানে! কাইজার! সে আসছে অপেরায়! আর আমিও যাবার সুযোগ পেয়েছি সেখানে!

'কখন?' কোনরকমে উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলাম।

'সন্ধ্যায়। আপনি রেডি থাকবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।'

খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে উঠে এলাম। রুমে ফিরে দরজা বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। নিষ্ফল ক্রোধে বালিশ চাদর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে করল। কাইজারের খবরটা এমন সময় পেলাম যখন সেটা পাঠাবার কোন উপায় নেই। পাঠালেও পৌঁছবে অনেক পরে। মনে হলো, যদি পাখি হতাম! উড়ে গিয়ে এক্ষুণি পৌঁছে দিতাম খবরটা।

তৈরি হয়েই ছিলাম। কর্নেলের চিঠি পেয়ে নামলাম তাড়াতাড়ি। গাড়িতে করে সোজা চলে গেলাম অপেরায়।

নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। প্রায় সবগুলো আসনই ভর্তি। তখনও আসেনি কাইজার। একটু পরেই অনেকগুলো বুটের শব্দে বুঝলাম, আসছে সে। সটান দাঁড়িয়ে গেল সবাই। দলবলে ঢুকল কাইজার। একটু অবাকই হলাম। এমন কিছু অসাধারণ নয় সে দেখতে। অথচ এরই অঙ্গুলিহেলনে এত যুদ্ধ? এত মৃত্যু?

কাইজার ঢুকে সবার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা ঝোঁকাল। দু'একটা কথাবার্তা বলল এর-ওর সাথে। তারপর নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল। শুরু হয়ে গেল অপেরা।

অপেরা চলছে। আমার মাথার মধ্যে দ্রুত চলছে চিন্তা। কাইজার, জার্মান-সম্রাট কাইজার। যার ধ্বংসের জন্যে এ পথে এসেছি, সে-ই বসে আছে আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে! চোখের সামনে থাকলে একজন লোকের প্রতি অনেক কমে যায় ঘৃণা। কিন্তু এখনও জানি, একটা রিভলভার পেলে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপত না তাকে খুন করতে। অবশ্য আমাকে মরতে হত। তাতে কি? হাত নিশপিশ করতে থাকল। রিভলভার, একটা রিভলভার যদি পেতাম শুধু!

একদৃষ্টিতে কাইজারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কর্নেলের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে চমক ভাঙল। কর্নেল কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'অপেরায় এনে ভুল করলাম নাকি! মনোযোগ তো পুরোটাই অল হাইয়েস্টের দিকে। আমার কথা কি ভুলেই গেলেন?'

হেসে বললাম, 'সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না! একটু সময় না হয় ওদিকে

তাকালামই।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল কর্নেলের। আস্তে করে চাপ দিল উরুতে।

অপেরার প্রথম পর্ব শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল সবাই। বিদায় নিয়ে চলে গেল কাইজার। আবার এসে বসলাম আগের জায়গায়। শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব।

কি হলো, কিছু ঢুকল না মাথায়। সমস্ত অনুভূতি মুছে গিয়ে শুধু একটাই বোধ জেগে আছে। এইবার। এইবার চরম সময় উপস্থিত।

চমক ভাঙল কর্নেলের ছোঁয়ায়। দেখি, উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। অপেরা শেষ। এবার যেতে হবে।

ঘড়ি দেখলাম। বেশ রাত।

আস্তে করে আমার হাত ধরল কর্নেল। গাড়ির কাছে পৌঁছতেই দরজা খুলে ধরল শোফার। আচ্ছন্নের মত উঠে বসলাম। কর্নেল উঠল। দরজা বন্ধ করে দিল শোফার। গাড়ি ছুটল হোটেলে। গাড়ির মধ্যে কিছুটা খুনসুটি করার চেষ্টা করল কর্নেল। কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখলাম তাকে।

হোটেলে ঢুকতেই বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গেল। কানের কাছে কে যেন অবিরাম বলে যাচ্ছে—সময় নেই, সময় নেই।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার গা ঘেঁষে এল কর্নেল। আশপাশে কাউকে না দেখে কোমর জড়িয়ে ধরল। বাধা দিলাম না। দিয়েও লাভ নেই। এখন কিছুই করতে পারব না আমি।

রুমের সামনে পৌঁছে ব্যাগ থেকে চাবি বের করলাম। চুমো দেবার চেষ্টা করল কর্নেল। কোনরকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'এখানে না, কেউ দেখে ফেলবে।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' দু'চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে বলল কর্নেল, 'তুমি কাপড়-চোপড় বদলে নাও, আসছি আমি।' হেসে নিজের রুমের দিকে চলে গেল সে।

রুমে ঢুকেই সিদ্ধান্ত নিলাম, পালাব। জিনিসপত্র যা ছিল তাড়াতাড়ি ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়েই সোজা ধাক্কা খেলাম কর্নেলের সঙ্গে।

হতভম্ব কর্নেলের মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, 'এ-কি? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি তখন। বললাম, 'আমি পারব না। ক্ষমা করুন আমাকে। না ভেবে রাজি হয়েছিলাম আপনার কথায়। মাফ করবেন। আমি পারব না ওসব।'

'কি আবোলতাবোল বলছ, বলো তো?' হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল কর্নেল। নরম গলায় বলল, 'তুমি তো নিজে থেকেই এলে। হঠাৎ কি হলো তোমার? এমন ছেলেমানুষের মত করছ কেন? কোন খারাপ ব্যবহার করে থাকলে মাফ চাইছি। বলো তো, কি হয়েছে তোমার?'

অবুঝের মত মাথা নেড়ে বললাম, 'কিছু হয়নি। আমি পারব না ওসব।'

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতেই খেপে উঠল কর্নেল, 'পারব না মানে? ওসব ন্যাকামো বাদ দাও। দেখি, আজ রাতে এখান থেকে কেমন করে যাও তুমি।'

আমাকে বুকের সাথে চেপে ধরল কর্নেল। ঠেলে নিয়ে চলল বিছানার দিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল ওয়েস্ট রুজবেকের সেই দৃশ্য। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারলাম। ছিটকে খাটের ওপর গড়িয়ে পড়ল কর্নেল। লাফিয়ে উঠল সাথে সাথে। পুরোপুরি ওঠার আগেই আবার ধাক্কা দিলাম প্রাণপণে। জানি না, অত সাহস আর শক্তি কোত্থেকে এসেছিল আমার। খটাশ করে খাটের রেলিংয়ে বাড়ি খেলো কর্নেলের মাথাটা। 'উহ্,' করেই মেঝেতে গড়িয়ে পরল কর্নেল। নড়ল না আর। বুঝলাম, জ্ঞান হারিয়েছে। কোনদিকে না তাকিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়েই

বেরিয়ে এলাম। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে তালা আটকে দিয়ে ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম যে সদর দরজায় এসে গেছি, সে খেয়ালও হয়নি আমার। খেয়াল হলো, যখন ডোরম্যান, 'গুড নাইট, ম্যাডাম' বলে হাসল।

ছুটতে ছুটতে স্টেশনে চলে এলাম। ভাগ্য এত ভাল যে প্রায় সাথে সাথেই ট্রেন পেয়ে গেলাম। ভোররাতে পৌঁছলাম রুলার্সে।

ব্যাগ থেকে কর্নেলের দেয়া পাসটা বের করলাম। ওটা ছাড়া এই সময় রাস্তায় চলা তো দূরের কথা, বেরই হওয়া যাবে না। বিশেষ করে আমার পক্ষে তো নয়ই।

ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে কাফে-তে পৌঁছলাম। কেন যেন আজকে জেগেই ছিল মা। কাফের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। হাত নাড়লাম। ছুটে নিচে নামল মা। দরজা খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম বুকে। মনে হলো, সমস্ত বিপদ কেটে গেছে আমার। এর চেয়ে নিরাপদ কোন আশ্রয় আর নেই পৃথিবীতে।

ঘরে গিয়ে ব্যাগটা রেখে পোশাক বদলে নিলাম। মা বলল, 'ক্যান্টিন-মা খবর রেখে গেছে।'

'কই?' ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কোথায়?'

চিরকুটটা এনে দিল মা। পড়লাম, 'তেষট্টি নম্বর কিছুদিনের জন্যে অন্য কাজে গেছে। খবর পাঠাতে হলে ভ্যানরুট ফার্ম হাউসে যাবেন। দরজায় পরপর দু'বার, তারপর একটু থেমে তিন বার টোকা দিলে মোটামত এক মহিলা খবর নেবে।'

কাগজটা পুড়িয়ে ছাইগুলো ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিলাম।

ব্রাসেলসে কর্নেলের সাথে আলাপে আর অপেরা হাউসের গল্পগুজবে বুঝেছিলাম, রুলার্সে আসবে কাইজার। কবে, কখন, সেটা জানতে পারিনি। এ খবরটুকুই লিখে ফেললাম।

ভ্যানরুট ফার্ম হাউস রুলার্স থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সন্ধ্যার মুখে বেরোলাম। মোটামুটি গা ঢাকা দিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তবুও থামতে হলো দু'জায়গায়। নাইট পাস ছিল। সুতরাং অসুবিধে হলো না কোথাও। খবরটা পৌঁছে দিয়ে নিরাপদেই বাড়ি ফিরলাম।

এর পরের পুরো একটা সপ্তাহ আতঙ্কে কাটল। বুটের আওয়াজ হলেই মনে হয়, এই বুঝি এল কর্নেল। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠি। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল সব।

দিন দু'য়েক পরে এলফন্স এল। ওর কাছে শুনলাম, কাইজার আসছে না রুলার্সে। কারণ সাত বোন, অর্থাৎ বৃটিশ এয়ারক্র্যাফট। সব সময় সাতটা প্লেন একসাথে আসত বলে জার্মানদের দেয়া নাম ওটা। খবরটা শুনে বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। অনেকগুলো মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করে দিয়ে এ যাত্রায় বোধ হয় বেঁচেই গেল কাইজার।

www.shopnil.com

নয়

আসব আসব করছে শরৎ। আকাশে পেঁজা তুলোর মত উদাস করা মেঘ। একঘেয়ে দিন কাটছে। কোন খবর নেই। শুধু হাসপাতালে যাওয়া আর আসা। এর মধ্যে ক্যান্টিন-মা চিরকুট পাঠাল, 'খুব সাবধানে থাকবেন। জার্মান স্পাইরা তৎপর হয়ে উঠেছে।'

সতর্ক হয়ে উঠলাম। আগের চেয়ে অনেক বেশি।

একদিন ঝামেলায় ফেলে দিল অটোফন। কাফেতে ঘাঁটি গাড়ার পর থেকে নড়েনি আর। ও যে জার্মান স্পাই এটা জানার পর থেকে মোটামুটি এড়িয়েই চলতাম ওকে। তবে ভয় পেতাম না। বোঝা হয়ে গিয়েছিল আমার। সুন্দর করে কথা বলতে পারে ও, চাই কি, চেহারা আর কথায় মেয়েও পটাতে পারে। কিন্তু স্পাইয়ের কাজ ওর মত মাথামোটার জন্যে নয়।

কিন্তু এই মাথামোটাই ফেলে দিল ঝামেলায়। কেন যেন ওর ধারণা হয়ে গেল, আমি ওকে সাহায্য করতে পারব। একদিন বাগানে বসে আছি, এগিয়ে এল ও। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসল। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খবর, কেমন আছেন?'

'ভাল আর রাখলেন কই?' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল অটোফন।

'সে কী?' অবাক হবার ভান করে বললাম, 'কি হলো আবার?'

'হয়েছে অনেক কিছুই।' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এল ও। ফিস ফিস করে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি। জীবন গেলেও বলবেন না কাউকে। বলুন রাজি?'

'রাজি।'

'আমি জার্মানীর হয়ে কাজ করছি। মানে গোপনে। মানে···, কি বলব, ধরুন, স্পাই।'

আঁতকে ওঠার ভান করলাম। চোখেমুখে প্রচণ্ড বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'বলেন কি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ, কাউকে বলবেন না। এখন আমাকে খানিকটা সাহায্য করবেন আপনি।'

এবার সত্যি সত্যি আঁতকে উঠলাম। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'আমি···মানে আমাকে···মানে আমি কি করে···।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি পারবেন,' আমাকে বাধা দিয়ে বলল অটোফন, 'আপনার মত বুদ্ধিমতী আর সত্যিকার অর্থে জার্মানীর ভাল চায় এমন মেয়ে ক'টা আছে, বলুন তো? তার ওপর বেলজিয়ান? না, না, আপনিই পারবেন। একটু চেষ্টা করলেই কত স্পাইয়ের হদিস বের করে ফেলতে পারবেন!'

প্রতিবাদ করতে গেলাম। কিন্তু আমাকে বাধা দিয়ে কাজটা করতে পারলে কি লাভ তার ফিরিস্তি দেয়া শুরু করলো অটোফন। শুনতে শুনতে মনে হলো স্পাই ধরিয়ে দিতে পারলে বোধহয় জার্মানীর ফার্স্ট লেডিই হয়ে যাব আমি।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'চেষ্টা করব।' বিকেলটা আর এভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। ও ব্যাটা এখন গেলে বাঁচি।

'শুধু চেষ্টা নয়। কাজটা করে দিতেই হবে আপনাকে,' মেয়ে ভোলানো হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল ও।

দিন কয়েক পরে ছোটখাটো একটা খবর জোগাড় হলো। বেশ কিছু সৈন্য যাচ্ছে স্থানীয় বিয়ারের কারখানায়। দিন-তারিখ আর সৈন্যসংখ্যা লিখে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে বেরোলাম। ক্যান্টিন মা-র কাছে আগেই খবর পেয়েছি ফিরেছে তেষট্টি নম্বর।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে চুলে হাত দিলাম। কাগজটা বের করতে যাব, সাথে সাথে মট করে ডাল ভাঙার শব্দ হলো একটা। লাফ দিল কলজেটা। নিজের অজান্তেই বসে পড়লাম। গুড়ি মেরে একটা গাছের আড়ালে সরে গেলাম। খশখশ শব্দ হলো খানিকক্ষণ। তারপরেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কয়েকজন। জলচারেক মনে হলো। সোজা পাঁচ নম্বর জানালার সামনে দাঁড়াল। সঙ্কেত অনুযায়ী টোকা দিল একজন। নিঃশব্দে খুলে গেল জানালা। অন্ধকারেও দেখলাম

www.shopnil.com

বেরিয়ে এসেছে তেষট্টি নম্বরের হাত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শুধু শুধু ভয় পেয়েছিলাম। উঠে দাঁড়াতে যাব, দেখলাম ঝট্ করে কোমর থেকে রিভলভার বের করল সামনের জন। নলটা উঁচু করেই গুলি ছুঁড়ল জানালা দিয়ে। গুলির প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে মিশে গেল তেষট্টি নম্বরের শেষ আর্তনাদ। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল প্রথমজন। পেছনে পেছনে বাকিরা।

সেদিনই প্রথম অনুভব করলাম মৃত্যুভয় কাকে বলে। ছুটে পালাতে চাচ্ছি। কিন্তু কে যেন পা-দুটো গেঁথে দিয়েছে মাটিতে। বহু কষ্টে পায়ে পায়ে পিছু হটতে শুরু করলাম। বেশ খানিকটা এসে ঘুরে দাঁড়িয়েই খিচে দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে বড় রাস্তায় ওঠার পরে আতঙ্ক কমল কিছুটা। দৌড় থামিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। এতক্ষণে তেষট্টি নম্বরের কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে দলা পাকিয়ে এল কান্না গলার কাছে।

তেষট্টি নম্বর! কোনদিন দেখিনি ওকে। জানি না কে সে, কি সে। কোনদিন জানাও হবে না আর। আবার একদিন মুক্ত হবে বেলজিয়াম। কিন্তু সেদিন তেষট্টি নম্বর থাকবে না। কে জানে, হয়তো আমিও থাকব না। চোখ ভিজে উঠল। একসময় গড়িয়ে নামল অশ্রুবিন্দু।

সারারাত এপাশ ওপাশ করলাম। একরাতেই চোখের কোলে কালি পড়ে গেল। সকালে চেহারা দেখে চমকে উঠল মা, 'কি হয়েছে, তোর?'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বলে ফেললাম সব। 'এখন খবরটা যে কি করে পাঠাই!'

'ভাবছিস কেন? ক্যান্টিন-মা-র কাছে দিলেই হবে। তার নিশ্চয়ই অন্য কোন রাস্তা জানা আছে।'

আসলে মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেছে সব। না হলে কথাটা আমারই আগে মনে পড়া উচিত ছিল।

জ্বালিয়ে খেলো অটোফন। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, 'কিছু হলো?'

ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠলাম। দিনের মধ্যে দশবার যদি একই প্রশ্ন শুনতে হয়, কতক্ষণ সহ্য করা যায়! সরাসরি না-ও করতে পারছি না। শেষে কি মনে করে বসে। ঝামেলায় পড়ে যাব তাহলে।

আরেকদিন জিজ্ঞেস করতেই বললাম, 'আচ্ছা, দেখি কি করা যায়!'

উল্টো বুঝল ও। ধরে নিল, কিছু একটার সন্ধান পেয়েছি, শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি। আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিল প্রায়। খুশির চোটে বলেই ফেলল, 'এতদিন পর্যন্ত কোনকিছুই করতে পারিনি, ফ্রাউলিন। ওপরওয়ালারা তো খেপে গেছে আমার ওপরে। আপনার সাহায্য পেলে, ফ্রাউলিন, একনাগাড়ে খবর দেয়া শুরু করব।' বেশ কিছু গোপনীয় খবরও শুনিয়ে দিল সে। কাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, কাকে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে, এসব।

সময় থাকতে তাদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যে খবর পাঠালাম আমি।

রোজ রোজ অটোফনের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে মেজাজ চড়ে গেল একদিন। একটু কড়া গলায়ই বললাম, 'আপনারা এত বড় বড় অফিসাররা এতদিনে কিছু করতে পারলেন না,আর আমি কি দু'দিনেই করে ফেলব নাকি সব?'

একটু থতমত খেয়ে গেল অটোফন। একটু ক্ষুণ্ণ মনেই বলল, 'না, না, সে-তো বটেই। তবে আরেকটু চেষ্টা করবেন।' তাড়াতাড়ি সরে গেল সে সামনে থেকে।

একদিন বিকেল। ছুটি ছিল সারাদিন। দুপুরে টানা ঘুম দিয়ে ঝরঝরে লাগছে শরীর। মুখহাত ধুয়ে, চুল আঁচড়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। সামনের মাঠে খেলছে বাচ্চারা। হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজে চমকে উঠলাম। বাচ্চারা হৈহৈ করে ছুটল

একদিকে। দেখি, আকাশ থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে একটা সাদা পায়রা। ছেলেরা পৌঁছোনোর আগেই ধপ্ করে মাটিতে পড়ল ওটা। এক জার্মান সৈনিক খুশিমনে দুটো চাপড় দিল রাইফেলে। শিস দিতে দিতে চলে গেল একদিকে।

বাচ্চারা পায়রাটা নিয়ে চেঁচামেচি করে খেলা শুরু করল। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলাম। উল্টাপাল্টা অক্ষর আর চিহ্ন দিয়ে চমৎকার একটা খবরের মত লিখে ফেললাম। গোল করে পাকিয়ে নিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধলাম কাগজটা। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, জবাই করা মুরগি আছে একটা। ব্যস। কাগজটার এক কোণায় একটু রক্ত মাখিয়ে দিতেই হয়ে গেল কাজ।

রাতের ডিউটি সেরে ভোরবেলা বাসায় ফিরেই ঘুম দিলাম। উঠলাম বেশ বেলা করে। খেতে খেতে শুনলাম, ক্যান্টিন-মা নিয়ে গেছে খবরটা। আপাতত তার মাধ্যমেই কাজ করতে হবে।

বিকেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সামনাসামনি পড়ে গেলাম অটোফনের। সাথে সাথে একই প্রশ্ন, 'কিছু হলো?'

বললাম, 'একটা জিনিস পেয়েছি। কিন্তু ওর কোন দাম আছে কিনা, বুঝলাম না।'

'কি পেয়েছেন?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল অটোফন।

'তেমন কিছু না। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম কতকগুলো ছেলে মরা একটা পায়রা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ওটার পায়ে কি যেন বাঁধা। কাছে গিয়ে দেখি, কাগজ। সুতো দিয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা। সন্দেহ হলো, গোপনীয় কোন খবর পাঠানো হচ্ছিল না তো? তাড়াতাড়ি খুলে নিলাম কাগজটা। কিন্তু পড়তে গিয়ে মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিছু।'

'কোথায়, কোথায় সেটা?' গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল অটোফন।

'দাঁড়ান,এনে দিচ্ছি।' এক দৌড়ে ওপর থেকে নিয়ে এলাম কাগজটা। 'এই যে!'

কাগজটা হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল ও। দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কোডে লেখা। আজকেই ডিসাইফারের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দিন তিনেকের মধ্যেই জানা যাবে, কি আছে এতে।' কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে গেল অটোফন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ফ্রাউলিন। বলেছিলাম না, আপনি পারবেন? দেখলেন তো? আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ, ফ্রাউলিন।'

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল অটোফন।

তিনটে দিন আর বিরক্ত করল না ও। চতুর্থ দিন বিকেলে সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হলো ওর সাথে। মুখ দেখেই বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে।

'আমার ঘরে একটু আসুন তো,' গম্ভীর গলায় বলল ও।

'কাগজটা কোথায় পেয়েছিলেন?' ঘরে পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল অটোফন।

'কেন? কি হয়েছে?' অবাক হবার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম। কিছুটা যেন উৎকণ্ঠিত ও।

'কাগজটা একেবারেই বাজে। ডিসাইফার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, কোন মাথামুণ্ডু নেই ওসব হিজিবিজি লেখার।'

'তাই তো, আপনাকে লজ্জায় ফেলে দিলাম।'

'আচ্ছা, আপনি ঠিক জানেন ওটা পায়রার পায়ে বাঁধা ছিল?'

'হ্যাঁ। আমি নিজে খুলেছি পায়রার পা থেকে।'

'কার কাছে পেয়েছিলেন পায়রাটা? কোথায়?'

থতমত খেয়ে গেলাম একটু। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ওই যে বললাম না, রাস্তায় কতকগুলো ছেলে টানাহেঁচড়া করছিল ওটা নিয়ে।' যে রাস্তায় দেখেছিলাম বলে

জানালাম, মাসখানেকের মধ্যে ওদিকে যাওয়া হয়নি আমার।

'যাদের কাছে পায়রাটা দেখেছিলেন ওদের চেনেন?'

'চিনব কি করে? ওরা কোথেকে খেলতে আসে, কে জানে! আর আমি তো এখানকার স্থানীয় লোক নই।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল অটোফন। ওর এই অসহায় চেহারা দেখে খারাপই লাগল আমার।

একসময় মাথা তুলল ও, 'খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেল, ফ্রাউলিন। হাই কমান্ড যা-তা বলেছে আমাকে।'

সত্যি সত্যি দুঃখ হলো এখন ওর জন্যে। বললাম, 'এক কাজ করলে হয় না? আমার কথা বলে দিন হাই কমান্ডকে।'

'তা হয় না, ফ্রাউলিন। এর সাথে আপনাকে জড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। দু'জনেরই বিপদ হবে তাতে।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল ও। ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম আমি।

তারার মেলা বসিয়ে রাত নেমেছে। অস্থির হয়ে বসে আছি। খবরটা কি পৌঁছোল? একটু পরেই গুরুগুরু আওয়াজে খুশি হয়ে উঠল মন। পেয়েছে তাহলে! এসে গেছে সাত বোন।

বাবার ডাকে কাফেতে গেলাম। মন রইল অন্যদিকে। কাফেতে জনাকয়েক জার্মান সৈনিক বসে আছে। ওরাও শুনেছে সাত বোনের গর্জন। পাত্তাই দিল না। ধরেই নিয়েছে, অন্য দিনের মত গোটাকয়েক গোলা-টোলা ছুঁড়ে বাড়ি ফিরবে ওগুলো।

প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত কাফেটা। এক নিমেষে থেমে গেল সব কথাবার্তা। পরমুহূর্তেই চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল সবাই। ছুটল সেলারে, ট্রেঞ্চে। শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ।

বৃষ্টির মত বোমা পড়ছে। লক্ষ্য, বিয়ারের কারখানা। প্রতিটা বিস্ফোরণের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে কাফেটা। একসময় থামল সব। জানালা দিয়ে দেখলাম, লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

রেডি হয়েই ছিলাম। আধাঘন্টার মধ্যে জরুরী তলব এল হাসপাতাল থেকে। ছুটলাম। পৌঁছে দেখি, শতশত আহত-নিহত সৈনিকে ভর্তি হয়ে গেছে হাসপাতাল। নিহতদের এক কোণে জড় করে রাখা হয়েছে। আহতদের চিৎকার, গোঙানি, আয়োডিন, রক্ত সব মিলিয়ে সে এক নারকীয় পরিবেশ!

কাজে নেমে পড়লাম। ভোরের আগে আর নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম না। ব্যান্ডেজ করতে করতে নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগল আমার। মৃত্যুর নির্দেশ পাঠিয়েছি যে হাতে, সে হাতেই বাঁচাতে চাইছি ওদের!

আবার ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করেছে অটোফন। এভাবে চললে তো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাবে কাজ করা। কখন কোন্ কাজে বাইরে যাব, ঠিক নেই। খোঁজ করে কখনও যদি না পায়, তাহলে ওর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান যাবে। শেষে এলফন্সকে জানালাম কথাটা।

'দেখি, কি করা যায়,' কথাটা শুনে গম্ভীরভাবে বলল এলফন্স। এরপর কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। ঠিক দু'দিনের মাথায় খবর পেলাম, মারা গেছে অটোফন। কেউ তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে মাথায়। দু'বার। রিভলভার দিয়ে। ভোরবেলা এক ট্রাক ড্রাইভার রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে খবর দিয়েছে হাসপাতালে।

www.shopnil.com

খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগল। মনটা ভারি হয়ে থাকল সারাদিন। মানুষ হিসেবে সত্যি সত্যিই ওকে পছন্দ করতাম আমি।

দিন দু'য়েক পরে হাসপাতাল থেকে ফিরছি। প্রচণ্ড ক্লান্ত। কখন বাসায় পৌঁছে ঘুমোব সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম একজনের গলা শুনে। দেখি, আধময়লা পোশাক পরা এক লোক। চাষী বলে মনে হলো। আমাকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকাতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'গ্রান্ড প্লেসটা কোন দিকে?'

'চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।'

'খুব ভাল হয় তাহলে। আচ্ছা, ক্যারিলন কাফেটা চেনেন?'

'হ্যাঁ, ওটা আমাদেরই।'

কাছাকাছি সরে এল লোকটা। আশপাশ দেখে নিয়ে নিচুস্বরে বলল, 'লুরা নামে কেউ থাকে নাকি ওখানে?' বলেই কোটের কলারে হাত দিল লোকটা, 'কি যে হয়েছে আজকাল! সেফটিপিন যে সেফটিফিন, তাও পাওয়া যায় না।'

নিঃসন্দেহ হলাম। কোটের কলারে হাত দিয়ে বললাম, 'আমিই লুরা।' সেফটিপিন দুটো দেখালাম।

'জরুরী আলোচনা আছে আপনার সাথে। আজ রাত সাড়ে আটটায় মাদাম স্টার্মের খামারবাড়িতে দেখা করবেন।' কথাটা বলেই একটু জোরে বলল, 'আচ্ছা, আসি তাহলে। অনেক উপকার করলেন আমার।' গ্রাম্যভাবে বিদায় জানিয়ে চলে গেল লোকটা।

মাদাম স্টার্মকে চিনি আমি। আমাকেও চেনেন তিনি। কিন্তু তিনিও যে আজকাল সেফটিপিনের ব্যবসা ধরেছেন সেটা জানতাম না। মনে হচ্ছে, সেফটিপিনের ব্যবসাটা বেশ লাভজনক হয়ে উঠেছে। অনেক লোক দেখতে পাচ্ছি এ লাইনে।

রাতের খাবার খেয়ে বেরোলাম। পৌঁছোলাম সাড়ে আটটার সামান্য কিছু আগে। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে মাদাম স্টার্ম। হেসে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?'

'ভাল,' হেসে উত্তর দিলাম, 'আপনি?'

'এই একরকম। চলো, ভেতরে চলো।' ওঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম।

ভেতরের ঘরে বসে আছে লোকটা। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, 'বসুন, ফ্রাউলিন।'

বসলাম। মাদাম স্টার্ম গেলেন পাশের ঘরে। খুটখাট আওয়াজ পেলাম। একটু পরেই দেখি, ট্রে-তে করে কফি নিয়ে আসছেন। আমাকে অবাক হতে দেখে হেসে ফেললেন, 'এখানে প্রায়ই আসতে হয় তো। তাই ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলা শুরু করল লোকটা, 'আমার নাম এডমন্ড। বেলজিয়াম আর্মির অফিসার। কিছুদিন হলো জার্মান আর্মির দূরপাল্লার কামান অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে আমাদের। ফ্রন্ট লাইনের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল পেছন পর্যন্ত গোলা ছুঁড়ছে ওরা। সেজন্যে কামানটা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছি আমরা। বেশ ক'জন নেমেছি এ-কাজে। প্রথমে আমি চেষ্টা করছি। আমি না পারলে বা মারা গেলে আসবে আরেকজন। সে না পারলে আরেকজন।

'প্রথমে খোঁজ নিলাম কামানটা আছে কোথায়। জানার পর প্যারাট্রুপার হিসেবে বেশ কিছুটা দূরে নামলাম। ভোরবেলা পৌঁছোলাম এখানে। বেলা বাড়লে বেরোলাম। ধারেকাছে কাজের ধান্ধায় ঘুরলাম সারাদিন। যে কোন কাজ পেলেই রাজি, কিন্তু পেলাম না। কোথাও নতুন লোক নিচ্ছে না এখন। জার্মানদের হুকুম। দিন দুই ফ্যাফা করে ঘুরলাম। এভাবে ঘুরতে দেখে একজন ঠাট্টা করে বলল,

''এখন কোন কাজকর্ম পাবে না হে! তার চেয়ে জার্মানদের আইন ভেঙে জেলে যাও। রাস্তা তৈরির কাজে লাগিয়ে দেবে। কাজ করবে, খেতে পাবে।'' জিজ্ঞেস করলাম, ''কোন রাস্তার কাজ?'' উত্তর শুনে লাফিয়ে উঠলাম খুশিতে। রাস্তাটা ঠিক কামানটার কাছেই। সন্ধ্যা নামতেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। হাবভাবে পুরো মাতাল। একটু পরেই পড়ে গেলাম এক জার্মান সৈনিকের সামনে। সোজা জেলে পুরে দিল ব্যাটা। পরদিন সকালে বিচার হলো। তিন সপ্তাহের জেল। দুপুরেই লাগিয়ে দিল রাস্তা তৈরির কাজে। তিন সপ্তাহ ধরে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছি জায়গাটা। কাজের সুবিধার জন্যে একটা ম্যাপও বানিয়েছি। এই যে ম্যাপ।' পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আমার দিকে দিল এডমন্ড। আবার শুরু করল, 'বোকার মত প্রশ্ন-টুশ্ন করে জানলাম, কামানের পাশে মাটির নিচে কংক্রীট গ্যালারি তৈরি করেছে ওরা। হাই এক্সপ্লোসিভ শেলগুলো ওখানে রেখেছে। গ্যালারির ছাদটা অনেক পুরু। তাছাড়া মাটির বেশ নিচেও। সাধারণ বোমায় কিছুই হবে না গ্যালারির। একমাত্র উপায় কাছাকাছি কোথাও ডিনামাইট ফিট করা। সেজন্যে ডিনামাইট স্টিকও জোগাড় করেছি। এখন ওটাকে জায়গামত বসিয়ে ধ্বংস করতে হবে কামানটা।' হাঁপাতে হাঁপাতে কথা শেষ করে চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল এডমন্ড। দেখলাম, ঘাম জমে গেছে ওর কপালে।

আগেই সন্দেহ হয়েছিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি অসুস্থ?'

'প্রায় তা-ই। গুলি লেগেছে কাঁধে। চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। আজকে ব্যথা হচ্ছে খুব।'

চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি জামা খুলতে বললাম ওকে। শিউরে উঠলাম খুলতেই। নিজের অজান্তেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। বিরাট একটা ঘা। পুঁজ আর রক্তের কষ গড়াচ্ছে। মনে হলো, সেপটিক হয়ে গেছে।

সেই অ্যাম্বুলেন্স উল্টে আহত হবার পর থেকে আমার ব্যাগের মধ্যে খানিকটা তুলো আর ব্যান্ডেজ সব সময় রাখি। কখন কাজে লাগে কে জানে! সেটাই বের করলাম। তুলোটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ঘা-টা পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। ব্যথায় কেঁপে উঠল এডমন্ড। তারপর ড্রেসিং করতে বসলাম। মনে হলো, অনেকটা সুস্থ বোধ করছে এডমন্ড। বলল, 'ফ্রাউলিন, যদি মারা যাই, খবরটা পৌঁছে দেবেন আমার রেজিমেন্টে। এডমন্ড, আট নম্বর রেজিমেন্ট। মনে থাকবে তো, ফ্রাউলিন?'

'অবশ্যই থাকবে,' তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিন্তু মৃত্যুর কথা ভুলে যান। কাজটা শেষ করতেই হবে। যদি বলেন তো আমিও সাহায্য করি আপনাকে।'

'না, না,' উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল এডমন্ড, 'আমার কাজ এটা! প্রাণ না যাওয়া পর্যন্ত আমি একাই করব এ কাজ।'

'তা করুন,' ব্যান্ডেজের শেষ গিঁটটা দিয়ে বললাম, 'তবে, শরীরের এই অবস্থা নিয়ে কিছু করতে যাবেন না। দিন পাঁচেক পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার আপনার।'

একটু হাসল এডমন্ড। ধরে নিয়ে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। মাদাম স্টার্মকে ওর দেখাশোনার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

চারদিন পরে চিঠি পেলাম এডমন্ডের। সন্ধ্যা ছ'টার পর কাফে ডনপার্ড-এ দেখা করতে বলেছে।

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। রুলার্স থেকে কাফে ডনপার্ড বারো কিলোমিটারের ধাক্কা। ভেবেচিন্তে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বেরোলাম। মেইন রোডে এসে দেখি ঝুনঝুন খটখট করতে করতে ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে একটা। মুহূর্তে বুদ্ধি খেলল মাথায়। হাত তুললাম। মুখে আবদারের হাসি। গাড়ি থামল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম কাছে। একটা হাসি উপহার দিয়ে বললাম, 'অনেক দূরে

www.shopnil.com

যাব। একটু এগিয়ে দেবেন?'

ঠাণ্ডা চোখে আমাকে কিছুক্ষণ দেখল লোকটা। তারপর বলল, 'ওঠো।'

উঠে পড়লাম। বাতাসে হিসিয়ে উঠল চাবুক। ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হয়ে গেল গাড়ি।

প্রকৃতিও ভাল ব্যবহার শুরু করল আমার সাথে। টিপটিপ করে শুরু হলো বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি গাড়ির হুড তুলে দিলাম। যাক, কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত। চট করে বার্লিন ভ্যাম্পায়ারদের চোখে পড়ছি না। ছ'টা বাজতে যখন মিনিট কুড়ি বাকি তখন হুডের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল কাফে ডনপার্ড। আসতে আসতে ঝাঁকুনিতে দিব্যি তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। নামার জায়গা দেখতে পেয়ে একটু নড়েচড়ে বসলাম।

হঠাৎ ডান দিকে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে চমকে তাকালাম। সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠল কলজেটা। এডমন্ড। প্রাণপণে বাঁয়ের জঙ্গলের দিকে ছুটছে। একটু পরেই কাফে ডনপার্ড থেকে বেরিয়ে এল দু'জন জার্মান অফিসার। ধাওয়া করল এডমন্ডকে। ছুটতে ছুটতেই কোমর থেকে রিভলভার বের করল একজন। রেঞ্জের মধ্যে পেতেই গর্জে উঠল রিভলভার। মুহূর্তে গতি বেড়ে গেল এডমন্ডের। এঁকেবেঁকে ছোটা শুরু করল। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে। পেছনে পেছনে অফিসার দু'জনও। কিছুক্ষণ পরপরই গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

আতঙ্কে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল সব। একসময় মনে হলো, কে যেন জিজ্ঞেস করছে, 'কোথায় নামবে?'

চমকে উঠলাম। দেখি, ঘোড়ার গাড়ির মালিক, প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে আছে। কোনরকমে বললাম, 'আরেকটু সামনে।'

কাফেটা পার হয়ে থামতে বললাম। নেমে বোধশক্তিহীন যন্ত্রের মত হাত ঢোকালাম ব্যাগে। ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি। ডাকার মত শক্তিও যেন নেই। লোকটাকে কৃতজ্ঞতা জানানো হলো না আমার! টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলাম খানিকক্ষণ। চামড়ায় পানির ছোঁয়া লাগতেই হুঁশ ফিরল। সাথে সাথে জেঁকে বসল চিন্তাটা। এই বৃষ্টির মধ্যে এত রাতে বাড়ি ফিরব কি করে?

বহু খুঁজেপেতে শেষ পর্যন্ত এক কোচোয়ানকে বের করলাম। এই বৃষ্টিতে সে কিছুতেই যাবে না। অনেক খাতির-তোয়াজ করে, বকশিশের লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম ওকে। গভীর রাতে কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

দুশ্চিন্তায় ঘুম হলো না সারারাত। এডমন্ডের কি হলো?

ভোরেই খবর পেয়ে গেলাম। ক্যান্টিন-মা দিয়ে গেল চিঠি। মাদাম স্টার্ম লিখেছেন, সাংঘাতিক আহত হয়েছে এডমন্ড। দেখা করতে চেয়েছে আমার সাথে।

ডিউটি আছে আমার। যেতে পারলাম না। তাছাড়া দিনের বেলা যাওয়াটাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাসপাতালে কাজ করলাম, কিন্তু সারা মন জুড়ে রইল এডমন্ডের চিন্তা।

সময় যেন আর কাটে না। বহু প্রতীক্ষার পর সন্ধ্যা নামল। সাথে সাথে বেরোলাম। ভালমতই পৌঁছোলাম খামার বাড়িতে। টোকা দিলাম দরজায়। দরজা খুলল মাদাম। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এডমন্ডের খবর কি?'

'ভাল না,' বিষণ্ণ গলায় বললেন মাদাম, 'মনে হচ্ছে, রাতটাও কাটবে না ওর।'

বিছানায় শুয়ে আছে এডমন্ড। ফ্যাকাসে বিবর্ণ চেহারা। একদিনেই ভেঙে পড়েছে শরীর। গায়ের ওপর একটা চাদর। বুকের ওঠানামা দেখে বোঝা যায়, এখনো বেঁচে আছে।

একটু তন্দ্রামত এসেছিল ওর। আমাদের পায়ের আওয়াজে চোখ মেলল। ওঠার চেষ্টা করতেই মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর। ছুটে গেলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম,

'উঠবেন না। যা বলার শুয়ে শুয়েই বলুন।'

ডান হাত বাড়িয়ে দিল এডমন্ড আমার দিকে। ধরলাম হাতটা। মুঠো করে চেপে ধরল ও। দুর্বল ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, ফ্রাউলিন। জার্মান গোয়েন্দারা তাড়া করে গুলি করেছে আমাকে। আপনি কালকে না গিয়ে ভালই করেছিলেন।'

বললাম, 'সব দেখেছি আমি। গাড়িতে ছিলাম তখন। আপনার অবস্থা দেখে আর কাফেতে ঢুকিনি। সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি।'

'খুব ভাল করেছিলেন, ফ্রাউলিন।' গলাটা আটকে গেল ওর। বহু কষ্টে একটু কেশে নিয়ে আবার শুরু করল, 'মরার জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু কাজটা শেষ করে যেতে পারলাম না। মরেও যে শান্তি পাব না আমি!'

'চুপ করে শুয়ে থাকুন,' থামাতে চাইলাম ওকে, 'একেবারে কথা বলবেন না।'

'আমাকে বলতে দিন। আর সময় নেই। আমার পকেটে ম্যাপটা আছে। খাটের নিচে দুটো ডিনামাইট স্টিক আছে। পারলে কাজে লাগাবেন।' চুপ করে গেল ও। মনে হলো, ঘুমিয়ে পড়ল। উঠতে যাব, হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ উঠল ওর গলার মধ্যে। বুঝলাম, সব শেষ হতে চলল।

শেষবারের মত বসতে চাইল ও। কিছুটা উঁচু করল শরীর। শেষ শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বেলজিয়াম! মা আমার! লিজেনবুম, ধ্বংস করব। হলো না, কিছুই…।'

ধপ্ করে বিছানায় পড়ে গেল শরীরটা। কাত হয়ে গেল মাথা। আস্তে করে সোজা করে দিলাম।

বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট! চলে গেল এডমন্ড। ওর এই আত্মবিসর্জন কেউ কি জানবে কোনদিন, মনে রাখবে কেউ?

পরদিন ক্যান্টিন মা-র হাতে আট নম্বর রেজিমেন্টে পাঠিয়ে দিলাম এডমন্ডের খবর।

www.shopnil.com

দশ

চব্বিশে ডিসেম্বর, উনিশশো পনেরো। তারিখটা এখনও জ্বলজ্বল করছে মনে। আগের দিন দশ-এগারো বছরের এক ছেলেকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। কেমন করে যেন গুলি খেয়েছে পায়ে। বাড়ি রুলার্সের কাছেই। দেখেই মায়া পড়ে গেল ওর ওপর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখে আসছি ওকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল আমার সাথে। একসময় ফিসফিস করে বলল, 'জানেন, সিস্টার, ভাল হয়ে গেলেই আমি লুকিয়ে হল্যান্ড চলে যাব। তারপর ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করব। বেলজিয়ামকে মুক্ত করতেই হবে।'

আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কত আগুন জমে আছে অতটুকু বুকে! এরই নাম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

একটু ভাল হতেই বায়না ধরল, বড় বোনকে দেখবে। পিঠেপিঠি ভাই-বোন ওরা। বোন ওর দু'বছরের বড়। যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই ধরে বলছে, 'ফিফাইনকে খবর দাও। আমার কথা বলো। আমি দেখতে চাইছি ওকে। তাহলেই দেখো, ছুটে আসবে ও।' দুপুরের মধ্যে সবার জানা হয়ে গেল ফিফাইন দেখতে কেমন, কি কি পছন্দ করে, ওর সাথে সে কি কি করে সব। এক সময় পাকড়াও

করল আমাকে। কার কাছে জেনেছে ওবার্তাজের নাম, বলল, 'সিস্টার, হের ওবার্তাজকে বলুন না আপনি। ফিফাইনকে খবর দিক। আপনি বললে ঠিক শুনবে।'

শেষ পর্যন্ত খবর পাঠানো হলো ফিফাইনকে। কাজের ফাঁকে এক ওয়ার্ডবয়কে যাতায়াত খরচ আর কিছু বকশিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

বিকেলে এল ফিফাইন। সঙ্গে একজন জার্মান অফিসার। ওয়ার্ডে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। চমকে উঠল ফিফাইন। ছুটে গেল ওর কাছে। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। চুমো দিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বুঝলাম ছোট ভাইকে খুবই ভালবাসে ও।

জার্মান অফিসারটা গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ফিফাইনের পাশে। দেখেই চোখমুখ কুঁচকে উঠল ছেলেটার, 'ও লোকটা কে? তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেন? চলে যেতে বলো ওকে।'

মুহূর্তে এক ঝলক রক্ত উঠে এল মেয়েটার মুখে। লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মুখ খুলল অফিসারটা। হাসিমুখে বলল, 'আমি তোমার বোনের বন্ধু। ও আমাকে খুব পছন্দ করে। তোমাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি। আমিও ওকে পছন্দ করি। তোমাকেও। এই নাও, এটা তোমার জন্যে।' পকেট থেকে একশো মার্কের একটা নোট বের করে এগিয়ে ধরল ছেলেটার দিকে। লাফ দিয়ে উঠে বসল ছেলেটা। কিছু বোঝার আগেই অফিসারটার কোমর থেকে ঝট করে টেনে বের করল রিভলভার। 'কুত্তার বাচ্চা, মর তুই!' গর্জে উঠল রিভলভার। পরপর দু'বার।

প্রচণ্ড ধাক্কায় কেঁপে উঠল অফিসারটা। দুটো গর্ত দেখা গেল বুকে। আধা সেকেন্ড পরই গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অফিসারটা তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। খিঁচুনি শুরু হলো। মৃত্যু যন্ত্রণায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় এক মুহূর্তে জমে গেল সবাই। গুলির শব্দে ছুটে এল গার্ড। অবস্থা দেখে ওরাও থমকে গেল। বোকার মত তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। ছেলেটার হাতে রিভলভার দেখেই বিদ্যুৎ খেলে গেল একজনের শরীরে। একলাফে এগিয়ে এল সে। ধাক্কা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল ছেলেটাকে। ছিনিয়ে নিল রিভলভারটা।

ফিফাইনকে দেখে মনে হলো, হঠাৎ যেন বাতাসে অক্সিজেনের অভাব পড়ে গেছে। ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করছে ও। হাত বাড়িয়ে শূন্যে ধরতে চাইল কি যেন। তারপর ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর। কেঁদে উঠল কষ্টে আর আতঙ্কে!

গ্রেপ্তার করা হলো ছেলেটাকে। ততক্ষণে মারা গেছে অফিসার। আরদালি এসে লাশ নিয়ে গেল।

দিন দশেকের মধ্যে ভাল হয়ে উঠল ছেলেটা। এ কয়দিন চব্বিশঘণ্টা কড়া পাহারা থাকল ওর পাশে। ভাল হতেই নিয়ে গেল। কোথায়, জানি না। দিন কয়েক পরে খবর পেলাম, জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। হয়তো ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবার জন্যে। এজন্য আর এত দূর নেবার দরকারটা কি ছিল?

পঁচিশে ডিসেম্বর। ক্রিসমাস ডে। একে তো বড়দিন, সেই সাথে পরপর কয়েকটা যুদ্ধজয়ের খবর পেয়েছে। খুশিতে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল জার্মানরা। অবিরাম গুলি ছুঁড়তে শুরু করল আকাশে। হঠাৎ রাইফেলের অবিশ্রান্ত গর্জনে চমকে উঠলাম। ধুকপুক করতে লাগল বুকের মধ্যে। মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। একটু পরেই ভুল ভাঙল। নিরাশ হলাম কিছুটা।

দু'দিন পরে গ্যারিসন থেকে অর্ডার এল, 'এখন হইতে যে কোন উৎসবে গুলিবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ঘোষণা করা হইল। প্রত্যেক কোম্পানী কমান্ডারকে এ-ব্যাপারে নজর রাখিতে নির্দেশ দেয়া যাইতেছে। আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে সামরিক আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।'

আদেশের ফলে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলো কিন্তু উৎসবের রেশ কমল না।

দু'জন ইংরেজ বন্দী ছিল হাসপাতালে। যথেষ্ট সুস্থ এখন। এই সুযোগে পালাতে পারবে ওরা।

ব্যবস্থা করে ফেললাম। এলফন্সকে দিয়ে চাষীর পোশাক জোগাড় করলাম দু'জনের জন্যে। ক্যান্টিন মা-কে বললাম, লোফেম বর্ডারের কাছে লোকের ব্যবস্থা করতে। তাহলে বর্ডার পার হতে পারবে ওরা। আমি বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেব ওদের। ফিরব ক্যান্টিন মা-র গাড়িতে। সেজন্যে গাড়িটা কাছাকাছি কোথাও রাখতে বললাম।

'ঠিক আছে, খবর পাঠাচ্ছি,' বলে চলে গেল ক্যান্টিন-মা। পরদিন ভোরবেলা মা-র কাছে জানিয়ে গেল, সব ঠিকঠাক।

সকালেই জানিয়ে রেখেছিলাম। রাত আটটার দিকে পালানোর কথা ওদের। পোশাক দুটো আমার রুমে লুকিয়ে রাখলাম। ওরা জানে, কোথায় পাওয়া যাবে।

সাড়ে আটটার দিকে বেরোলাম। হাসপাতালের পেছন দিকে খিড়কি দরজা আছে। ওটা দিয়ে বেরিয়ে খানিকদূর গেলে ডানদিকে রাস্তা পড়ে একটা। সামান্য এগোলেই বাঁয়ে পড়ে একটা পোড়োবাড়ি। রাস্তাটায় রাতে লোক চলাচল থাকে না বললেই চলে।

খুব সাবধানে পৌঁছোলাম বাড়িটাতে। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলাম। দেখি, আমার আগেই হাজির হয়েছে ওরা।

বাড়িটা পোড়োবাড়ি হলেও, দরজা জানালাগুলো মোটামুটি অক্ষতই আছে। টেনেটুনে বন্ধ করে দিলাম সবগুলো। কিন্তু ফাঁকফোকর থেকেই গেল। আলো জ্বাললে বাইরে থেকে দেখা যাবে।

সাবধানে টর্চ জ্বেলে পেছনের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ছোট্ট একটা ঘর। মেঝেতে খড় জড় করা। চমৎকার। বসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাবে।

চাষীর ছদ্মবেশ যাতে আরও নিখুঁত হয় সেজন্যে পাইপ আর তামাক নিয়ে এসেছি ওদের জন্যে। পাইপ দেখে খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল দু'জন। তামাক ভরে ধরিয়ে নিল পাইপ। চিমনির মত ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলাম। সময় শেষ। এবার রওনা হতে হয়।

পা টিপে টিপে সদর দরজায় এলাম। ফিসফিস করে বললাম, 'আপনারা দাঁড়ান। আমি বাইরের অবস্থা দেখে নিই আগে।'

নিঃশব্দে খোলার চেষ্টা করলাম দরজা। খুলল ক্যাঁচক্যাঁচ করে আপত্তি জানিয়ে। আস্তে করে মাথাটা বের করতেই বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'কে ওখানে?'

ছোটখাট একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। চমকে উঠতেই দরজায় ঠুকে গেল মাথা। দু'জন বার্লিন ভ্যাম্পায়ার। বসে বসে সিগারেট টানছিল। শব্দ পেয়েই রাইফেল হাতে লাফিয়ে উঠেছে।

কোনরকমে মাথাটা ভেতরে টেনেই দড়াম করে বন্ধ করলাম দরজা। অন্ধকারের মধ্যেই খিঁচে দৌড় দিলাম পেছনের দিকে। ভয়ের চোটে টর্চ পর্যন্ত জ্বালাতে ভুলে গেছি।

আতঙ্কে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। পালাব কি করে? হঠাৎ খেয়াল হলো সেলারের কথা। কিন্তু দরজাটা কোথায়? খুব সম্ভব খড়ের গাদার নিচে চাপা পড়ে

www.shopnil.com

আছে।

'শিগগির হাত লাগান,' চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলাম, 'সেলারের দরজা খুঁজে বের করতে হবে। বাইরে বার্লিন ভ্যাম্পায়ার।'

ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন। প্রাণপণে খড় সরাতে লাগল। হঠাৎ কি করে যেন একজনের মুখ থেকে ছিটকে গেল পাইপ। খড়ের স্তূপের ফাঁক গলে ভেতরে চলে গেল। একমুহূর্ত পরেই দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। দ্রুত ছড়িয়ে গেল চারপাশে।

কাঁদতে বাকি রাখলাম শুধু আমরা। পাগলের মত খড় সরাতে লাগলাম। হঠাৎ হাতে ঠেকল একটা আংটা। টান দিতেই ঢাকনা সুদ্ধ উঠে এল। ধাপে ধাপে সেলারে নেমে গেছে সিঁড়ি। হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। শেষের জন টেনে বন্ধ করে দিল ঢাকনা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভেবেই পেলাম না, এই অন্ধকারে কি করব।

'টর্চটা একবার জ্বালান তো।' সাথে সাথে মনে পড়ল, টর্চটা তখনও রয়েছে আমার হাতে। লাল হয়ে গেলাম লজ্জায়। তাড়াতাড়ি টর্চের বোতাম টিপলাম। একটা পার্টিশন সামনে। একপাশে ছোট্ট দরজা। দরজার ওপাশে যেতেই চোখে পড়ল জানালাটা। বেশ খানিকটা ওপরে।

দ্রুত বললাম, 'কাঁধে তুলে নিন একজনকে। সাবধানে দেখুন, বাইরে আছে নাকি কেউ।'

নিচু করে টর্চ জ্বেলে রাখলাম। একজনের ঘাড়ে চড়ে আস্তে করে জানালা দিয়ে মাথা গলাল অন্যজন। একটু পরেই জানাল, 'নাহ্, কেউ নেই।' প্রথম জনের ঘাড়ের ওপর পা রেখে উঠে গেল সে।

'এবারে আপনি।' হাত উঁচু করলাম। কোমর ধরে বাচ্চা মেয়ের মত শূন্যে তুলে ফেলল প্রথমজন। বাড়িয়ে দেয়া হাত জড়িয়ে ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

লাফ দিয়ে জানালার ফ্রেম চেপে ধরল ভেতরের জন। টেনে হিঁচড়ে তুলে আনলাম ওকে। কোনদিকে না তাকিয়ে ছোটা শুরু করলাম। যত দ্রুত সম্ভব সরে যেতে হবে এখান থেকে।

খানিক দূর যাবার পর খেয়াল হলো, ভুল রাস্তায় এসেছি আমরা। সাথে সাথে উল্টো দিকে ফিরলাম। বড় রাস্তা ছেড়ে হাঁটা পথ ধরে কিছুদূর যাবার পর চোখে পড়ল দুটো আলো। এগিয়ে আসছে দ্রুত। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। জার্মান মোটর সাইকেল। উদভ্রান্তের মত তাকালাম চারপাশে। কিছু নেই। না কোন গাছপালা, না কোন ঢিবি। মৃত্যু এবার নিশ্চিত। শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল ড্রেনটা। পানি কাদা আর পচা পাতায় ঠাসা। কিসের কি! প্রাণের মায়া বড় মায়া। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ড্রেনে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে রইলাম। ডিসেম্বরের তীব্র ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে এমন ঠকঠকানি শুরু হয়ে গেল যে সন্দেহ হলো, শেষ পর্যন্ত এই শব্দেই ধরা পড়ে না যাই। ঠোঁট কামড়ে ধরেও লাভ হলো না। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শরীর।

শাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মোটর সাইকেল দুটো। লক্ষই করল না কোনদিকে।

কাদামাখা ভূত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর। আর কাদা মেখে একেকজনের যা চেহারা হয়েছে! কাউকে আলাদা করে চেনারই উপায় নেই। সেই সাথে পচা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসতে চায়।

পা আর চলে না। তবু ছুটলাম। বেশ খানিকক্ষণ পরে চোখে পড়ল আলো। শরীরে যেন শক্তি ফিরে এল। ছুটলাম ওদিকে। ওটা যদি হোটেলটার আলো হয় তাহলে ধারে কাছেই থাকার কথা কারও।

আরেকটু এগোতেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল লোকটা। এক হাত পকেটে ঢোকানো। থমকে দাঁড়ালাম। খারাপ সম্ভাবনাটাই মনে এল আগে। যদি সত্যি হয়, তাহলে এ-ই শেষ।

সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকলাম লোকটার দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ও। কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? বর্ডারে?'

বুক থেকে পাঁচমণি পাথর নেমে গেল একটা। দ্রুত বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'চিন্তার কোন কারণ নেই। সবকিছু ঠিকঠাক আছে।'

ইংরেজ সৈনিক দু'জনকে বললাম, 'আসি তাহলে। বেঁচে থাকলে দেখা হবে আবার।'

এগিয়ে এল ওরা। দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরল আমার হাত, 'জীবনে আপনার কথা কোনদিন ভুলব না, সিস্টার।'

চলে গেল ওরা। এবার ক্যান্টিন মা-র গাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। সামনে এগিয়ে গেলাম। একটু পরেই পেয়ে গেলাম গাড়িটা। একটা গাছের আড়ালে রাখা।

দূর থেকে এই চেহারায় দেখেও চিনতে পেরেছে ক্যান্টিন-মা। আরেকটা গাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে।

ঠেলেঠুলে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল ক্যান্টিন-মা। শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নেই। সটান শুয়ে পড়লাম। বস্তা দিয়ে পুরো শরীর ঢেকে দিল ক্যান্টিন-মা। গভীর রাতে বাড়ি ফিরলাম। ওই রাতেই গরম পানি দিয়ে গোসল সারতে হলো। লেপের নিচে শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মনে হলো, ট্রেঞ্চে যারা যুদ্ধ করছে, তারা বেঁচে আছে কি করে।

সকালে ডিউটি। শরীর আর চলে না। যেতে হবে তবুও। না গেলেই সন্দেহ করবে। কোনরকমে গেলাম। হাঁটার সময় মনে হলো, আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটছি। দু'পায়ের পাতা জ্বলে যাচ্ছে। কি করে যে সময়টুকু পার করলাম নিজেও জানি না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুনলাম ওবার্তাজের গলা। ধমক দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছেন গার্ডদের। কোনদিন এত রাগতে দেখিনি ওবার্তাজকে।

শনিবার। ক্লান্তি লাগছিল। তাই একটু আগেভাগেই ফিরেছি আজকে। ভাবলাম বাগানে বসি কিছুক্ষণ। সিঁড়ির কাছে আসতেই ওপর থেকে ভেসে এল ফ্যাসুজেলের গলা, 'কালকে চার্চ প্যারেড ক'টায় হচ্ছে?'

'দশটায়,' অপরিচিত একটা কণ্ঠ উত্তর দিল।

এক নিমেষে সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে গেল। চার্চ প্যারেড! অনেক সৈনিক জমা হবে একসাথে। সাত বোনকে পাঠাতেই হবে খবরটা।

'ধুৎ, যত সব ফালতু কাজকারবার,' গজগজ করতে করতে বলল ফ্যাসুজেল, 'কোথায় রোববারে সেঁটে ঘুম দেব, তা না সাত সকালে উঠে বিশপের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হবে। আর কাজ পেল না! যুদ্ধ শেষ হলে ওসব কথা শোনার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'কি আর করবে? কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কাল তাহলে ন'টার দিকে রওনা হই, কি বলো? ওয়েস্ট রুজবেকে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।'

'ঠিক আছে। গাড়ি নিয়ে এসো, আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই দ্রুত সরে এলাম। কোথায় পালাল ক্লান্তি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে আমার। বহুদিন পরে খবরের মত খবর পেয়েছি! দ্রুত লিখে ফেললাম খবরটা। সন্ধ্যায় বেরোলাম। খবরটা পৌঁছে দিয়ে জরুরী তাগাদা

www.shopnil.com

দিলাম আজকেই পাঠিয়ে দিতে। কাল সকালের মধ্যেই যেন পৌঁছে যায়।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। একসময় শান্ত হয়ে এল স্নায়ুগুলো। ঘুম ভাঙল ভোরে।

সকাল সাতটার মধ্যে পৌঁছোলাম হাসপাতালে। একটু পরেই ডাক পড়ল ওবার্তাজের রুমে।

'শোনো,' রুমে ঢুকতেই ওবার্তাজ বললেন, 'দশটায় চার্চ প্যারেড হচ্ছে ওয়েস্ট রুজবেকে। রোগীদের মধ্যে যারা চলতে-ফিরতে পারে তাদেরকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে এখুনি চলে যাও ওখানে।'

মুচকি হেসে বেরিয়ে এলাম। কেন হাসলাম, নিজেও জানি না। রওনা দিতে দিতে ন'টা বেজে গেল। দুটো অ্যাম্বুলেন্স ভর্তি রোগী। সেজন্যে আস্তে চালাতে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। দশটা বেজে গেল ওয়েস্ট রুজবেকে পৌঁছুতে।

চার্চের মাঠ ভরে গেছে সৈনিকে। আমরা পৌঁছোনোর পরপরই শুরু হলো বিশপের ভাষণ। নিঃশব্দে শুনছে সবাই।

বহু দূরে ভোমরার গুঞ্জনের মত আওয়াজ উঠল। কান পেতে ছিলাম বলে হয়তো আমিই প্রথম শুনলাম শব্দটা। আস্তে আস্তে বেড়ে উঠল গুঞ্জন। সচকিত হয়ে উঠল সবাই। একটু পরেই বিকট গর্জনে পরিণত হলো শব্দটা। এসে গেছে যম। সাত-বোন।

শুরু হয়ে গেল বোমাবৃষ্টি। বক্তৃতা থেমে গেল। মুহূর্তে নরক ভেঙে পড়ল চার্চের মাঠে।

লাফিয়ে নামলাম অ্যাম্বুলেন্স থেকে। গড়িয়ে নিচে চলে গেলাম। কিছুটা নিরাপদ এখানে।

বোমা ফাটার শব্দে কানে তালা লেগে গেছে। ভূমিকম্পের মত কাঁপছে মাটি। ফোয়ারার মত শূন্যে উঠে যাচ্ছে ইট, কাঠ, মাটি, মানুষের শরীরের টুকরো। তারপর অলস ভঙ্গিতে নামছে মাটিতে।

ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। দম বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। খক খক করে শুরু হলো কাশি। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি বেরিয়ে এল!

সময়ের হিসাব মুছে গেল। ভুলেই গেলাম, কোথায় আছি। এক সময় খেয়াল হলো, থেমে গেছে সব।

হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। চারপাশের অবস্থা দেখে থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর। এত মৃত্যু একসাথে দেখিনি কখনও। হাজার হাজার আহত আর নিহত সৈনিকে ভর্তি হয়ে আছে মাঠ। অনেকের মৃতদেহ চেনারও উপায় নেই। একেবারে ভর্তা হয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখলাম, হাঁটুর নিচ থেকে আস্ত একটা পা। পড়ে আছে মালিকবিহীন অবস্থায়। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে চারপাশে। বারুদ, ধোঁয়া আর আহতের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত বাতাস। যারা অক্ষত আছে, প্রাণপণে শুশ্রূষা করার চেষ্টা করছে আহতদের। একজন অফিসার আমাকে দেখেই ছুটে এল, 'এক্ষুণি চলে যান রুলার্সে। হের ওবার্তাজকে বলে অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, ড্রেসার, ওষুধপত্র সব নিয়ে আসুন। তাড়াতাড়ি।' ছুটে অন্যদের কাছে চলে গেল অফিসারটা। স্বপ্নেও কি জানবে সে, কাকে বলে গেল কথাগুলো?

www.shopnil.com

BanglaBook.org

এগারো

অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন কোন খবর নেই। হাসপাতালে যাই, বাসায় ফিরি। এইসব। বিরক্তি ধরে গেছে।

একদিন হাসপাতালে আমার রুমে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। এসময় এলফস এল। জিজ্ঞেস করল, 'এয়ারপোর্টে যাবেন নাকি, সিস্টার?'

লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, 'অবশ্যই। কিন্তু কিভাবে?'

'এয়ারপোর্টের মেডিকেল হাট কিছু ওষুধপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। সেগুলো নিয়ে যেতে হবে। আপনি চেষ্টা করলেই সাথে যেতে পারবেন।'

সাথে সাথে ছুটলাম ওবার্তাজের রুমে। অনুমতি পেতে লাগল দু'মিনিট। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হয়ে গেলাম।

মেডিকেল হাট-এ ঢুকে দেখি একজন অফিসার মাথা নিচু করে কি যেন লিখছে। চেনাচেনা লাগল চেহারা। আমার পায়ের শব্দে খেঁকিয়ে উঠল, 'বললাম না, কেউ যেন এখন বিরক্ত না করে? তারপরেও...।' মাথা তুলে আমাকে দেখেই থমকে গেল। সাথে সাথে চিনলাম ওকে। তিন নম্বর অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশনের ফিল্ডওয়েবেল সোয়েজার।

'আরে, আপনি কোত্থেকে?' তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এল সোয়েজার, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! আপনিই এসেছেন নাকি হাসপাতাল থেকে!'

হেসে বললাম, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন, বসুন,' ব্যস্ত হয়ে ওর চেয়ারের কাছাকাছি একটা চেয়ার ছেড়ে দিল সোয়েজার, 'বসুন। এত দিন পরে দেখা। খবরাখবর কি বলুন।'

বললাম, 'খবরাখবর আর আমি কি বলব? আপনারাই তো খবরের ডিপো।'

হো হো করে হেসে উঠল সোয়েজার, 'তা যা বলেছেন।' তারপর শুরু হলো গল্প। একনাগাড়ে বলতে শুরু করল যা যা বলার মত আছে। শুনতে থাকলাম মনোযোগ দিয়ে। দামী কথা যদি পাওয়া যায় কিছু।

'জানেন, ফ্রাউলিন, যুদ্ধ শেষ হলো বলে। তারপর...'

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, 'বলেন কি? সন্ধি করে ফেলবেন আপনারা?'

'ধুৎ, সন্ধির কথা কে বলছে? আমি বলছি যুদ্ধে জেতার কথা। চূড়ান্ত বিজয় তো বাড়ির দরজায়।'

'তাই নাকি? কি করে বুঝলেন?'

'বুঝলাম এই কারণে যে আমাদের ম্যাথি এবার ইংরেজদের এমন মার দেবে যে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে হবে না বাছাধনদের।'

'ম্যাথি কে?'

'ম্যাথিকে চেনেন না?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সোয়েজার, 'গ্রেট ম্যাথি, আমাদের জ্যাপিলীন লিডার। তার নাম শোনেননি?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লাম।

'আশ্চর্য!'

হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তা শিক্ষাটা দিচ্ছেন কবে?'

'পয়লা অক্টোবর। ওইদিন মাটির সাথে মিশে যাবে লন্ডন। এগারোটা জ্যাপিলীন যাবে। দুটো ছাড়া বাকিগুলো ফ্লাই করবে ফাদারল্যান্ড থেকে। ম্যাথি

লিডার। দেখবেন, কেমন শিক্ষাটা দেয় ম্যাথি। আশা করছি, বড়দিনের আগেই বাড়ি ফিরব।' আরও কি কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সোয়েজার। মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদল করল, 'ধুৎ, এতক্ষণ খালি বকর বকর করছি। তার চেয়ে অন্য আলাপ করি। তা আপনি অত দূরে বসেছেন কেন? আরেকটু কাছে এসে বসুন।'

হেসে বললাম, 'কাছেই তো আছি। আর কত কাছে চান?'

এক মুহূর্তে পুরো বদলে গেল সোয়েজার। বলল, 'কত কাছে? একেবারে বুকের মধ্যে।' চমকে ওঠারও অবকাশ দিল না, এক লাফে উঠে এল। দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। তার আগেই পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে ছাড়াতে চাইলাম নিজেকে। অনায়াসে আমাকে বয়ে নিয়ে গেল একটা স্ট্রেচারের কাছে। চিত করে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর উঠে এল সোয়েজার। অনুভব করলাম, আগেও দু'বার হয়েছে এমন, কিন্তু আতঙ্কটা এক। প্রচণ্ড অসহায় লাগল নিজেকে। কতবার বেঁচে যাব?

কিলবিল করতে করতে সোয়েজারের হাত নেমে এল কোমরে। হাতড়াচ্ছে। স্কার্টের বোতাম খুঁজছে।

সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা দিলাম ওকে। সামান্য একটু নড়ে উঠল শুধু। মনে হলো, পাহাড় চেপে বসেছে বুকের ওপরে। শেষ চেষ্টা হিসেবে যা কোনদিন করিনি তাই করলাম। চিৎকার করে উঠলাম। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে চাইল সোয়েজার। ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিলাম মুখ। আবার চিৎকার করলাম। আরও জোরে।

দেখতে পেলাম, খোলা দরজা দিয়ে প্রায় দৌড়ে ঢুকল একজন অফিসার। বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠল, 'কি হচ্ছে এসব?'

লাফিয়ে উঠল সোয়েজার। পোশাক-টোশাক ঠিক করার আগেই চিৎকার শুনল, 'অ্যাটেনশন।'

খটাশ করে বুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোয়েজার।

কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে আমার। টেনেটুনে কাপড়চোপড় ঠিক করার ফাঁকে শুনলাম চিৎকার, 'ডিউটিতে কে এখানে?' দু'এক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। আবার গর্জে উঠল অফিসার, 'ডিউটি ফাঁকি দিয়ে এইসব করা হচ্ছিল?' হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল অফিসারের, 'আরে ফ্রাউলিন! আপনি এখানে? এ কি অবস্থা?'

চমকে মুখ তুললাম। সাথে সাথে চিনলাম পাইলটকে। সাংঘাতিক আহত হয়ে আমাদের হাসপাতালে ছিল অনেকদিন। তখন থেকেই পরিচয়। বললাম, 'অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আপনাদের মেডিকেল সাপ্লাই পৌঁছোনোর পুরস্কার এটা।'

'ছি, ছি, ছি। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, ফ্রাউলিন। আপনি আসুন আমার সাথে।' সোয়েজারের দিকে ফিরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কালকেই তোমার নামে রিপোর্ট করছি আমি। বেশ ভালই লিখব, চিন্তা কোরো না।'

লেফটেন্যান্ট পাইলটের সাথে বেরিয়ে এলাম বাইরে। অনেকটা সুস্থ লাগছে এখন। কাঁপুনিটা গেছে।

বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে লেফটেন্যান্ট বলল, 'অনেকদিন পরে দেখা হলো। চলুন না আজ আমার সঙ্গে ডিনারে। এমন সৌভাগ্য তো আর রোজ রোজ হয় না!'

আমাকে বাঁচানোর জন্যে একটু কৃতজ্ঞতাও এসে গিয়েছিল লেফটেন্যান্টে ওপর। তাছাড়া কোন খবর যদি জুটে যায়! সেজন্যে বললাম, 'কি যে বলেন। সৌভাগ্য তো আমার। তবে আমি কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। হাসপাতালে কাজ পড়ে আছে অনেক।'

www.shopnil.com

'না, না, মোটেই দেরি হবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল অনেকগুলো ছোট ছোট বাইপ্লেন। ধরনটা নতুন মনে হলো। আগে দেখিনি কখনও। লাইন দিয়ে রাখা সব। জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কি?'

'নতুন ধরনের বাইপ্লেন,' উত্তর দিল লেফটেন্যান্ট, 'একেবারে নতুন। কারখানা থেকে টেস্ট করার জন্যে সোজা এখানে পাঠিয়েছে। কমান্ড্যান্টের জন্যে এগুলোর টেস্ট রিপোর্ট লেখার সময়ই তো আপনার চিৎকার শুনে ছুটলাম।'

হেসে ফেললাম, 'আপনার কাজের দেরি করিয়ে দিলাম।'

'না, না, তাতে কি? রিপোর্ট লেখা শেষ। শুধু ঠিকানাটা লেখা বাকি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন দেখলেন প্লেনগুলো?'

'চমৎকার,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'এরকম ছোট আর দ্রুতগামী প্লেন আমাদের ছিল না বলে এতদিন খুব লাফালাফি করেছে বৃটিশ এয়ারফোর্স! এইবার এমন শিক্ষা দেব ব্যাটাদের···!' কথাটা শেষ না করে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মারল লেফটেন্যান্ট।

রুমে ঢুকলাম লেফটেন্যান্টের। বসতে বসতে লেফটেন্যান্ট বলল, 'ডিনারের কথা তো বললাম, কিন্তু কি যে খাওয়াতে পারব নিজেও জানি না। কিছুই তো প্রায় পাওয়া যায় না এখানে।'

কথা বলতে বলতে বাটলারকে ডাকল লেফটেন্যান্ট। বাটলার আসতেই হুকুম দিল লেফটেন্যান্ট, 'ডিনার। দু'জনের জন্যে। জলদি!' চলে গেল বাটলার।

উঠে গিয়ে আলমারি খুলল লেফটেন্যান্ট। দুটো গ্লাস আর একটা মদের বোতল বের করল। আমার দিকে তাকাতেই মাথা নাড়লাম। হেসে একটা গ্লাস রেখে দিল। অন্য গ্লাসটা ভর্তি করে বোতলটা জায়গামত রেখে আগের জায়গায় এসে বসল। গ্লাসটা উঁচু করে ধরে বলল, 'আপনার স্বাস্থ্য পান করছি, ফ্রাউলিন।'

এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস খালি করে বলল, 'এরকম জায়গায় আপনার মত কাউকে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি।'

টেবিলের ওপর খাম পড়ে ছিল দুটো। একটায় অসম্পূর্ণ ঠিকানা লেখা। খামটা দেখিয়ে বললাম, 'এখনও পুরো ঠিকানা লেখেননি কিন্তু।'

'তাই তো, তাই তো!' তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কলম বের করে ঠিকানাটা পুরোপুরি লিখল লেফটেন্যান্ট। লেখা শেষ করে খাম দুটো রেখে দিল একপাশে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পাঠালেন না?'

'পাঠাব। তেমন জরুরী কিছু নয়। একটা আমার ছুটির দরখাস্ত যে মঞ্জুর হয়েছে তার কপি। অন্যটাতে সেই বাইপ্লেনগুলোর রিপোর্ট। পাঠাব ধীরেসুস্থে।'

'আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। পাওনা হয়ে আছে অনেকদিন থেকে। নেয়া হয়নি। আজকেই অনুমতি পেলাম। ছুটিতে যাব অবশ্য পয়লা অক্টোবরের পরে।'

'কেন?'

'ম্যাথির সাথে ওইদিন আবার একটু লন্ডনে যাব। ব্যাটাদের শিক্ষাটা দিয়েই না ছুটিতে যাই।'

'ছুটি তো পেয়েই গেছেন। দরখাস্ত আবার পাঠাচ্ছেন কোথায়?'

'আর বলবেন না। আমাদের সবকিছু ব্রিগেড মেজরকে রিপোর্ট করতে হয়। এক সময় মনে হয়, বউয়ের সাথে বিছানায় গেলেও বলে যেতে হবে ওদের।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল লেফটেন্যান্ট। হাসিটা কমলে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, ফ্রাউলিন। আসলে কেউ ছুটিতে থাকলে কোন অফিসার কোথায়

কতদিন ছুটিতে থাকবে সবকিছু ব্রিগেড মেজরকে জানাতে হয়।'

লেফটেন্যান্টের কথা শুনছি আর মাথার মধ্যে একশো মাইল গতিতে চলছে চিন্তা। বাইপ্লেনের রিপোর্টটা কি করে হাত করা যায়! হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। অত্যন্ত সোজা সমাধান। স্টিফেন আছে ব্রিগেড মেজরের অফিসে। সুতরাং খামের ভেতরের জিনিসগুলো বদলে দিতে পারলেই হয়। শুধু সুযোগটা দরকার। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। ঈশ্বর বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। শুনলেন প্রার্থনা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট, 'একটু আসছি, ফ্রাউলিন। বাটলার ব্যাটাকে একটা কথা বলে আসি।'

লেফটেন্যান্ট বাইরে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম খাম দুটোর ওপর। খোলাই ছিল। মুহূর্তের মধ্যে বদলাবদলি করে দিলাম ভেতরের জিনিস। একটু পরেই ফিরল লেফটেন্যান্ট। পরম তৃপ্তি নিয়ে লক্ষ করলাম, আঠা দিয়ে খাম দুটো বন্ধ করল ও। রেখে দিল পাশে।

ডিনার সার্ভ করল বাটলার। ফেরার সময় নিয়ে গেল চিঠি দুটো।

খেতে খেতে অনর্গল কথা বলে গেল লেফটেন্যান্ট। আমি শুধু হাঁ-হুঁ করে সায় দিয়ে গেলাম ওর কথায়। খাওয়া শেষ করে হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল লেফটেন্যান্ট। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। আবার কি সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি? অতিকষ্টে মুখটা স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

'যাতে আমাদের কেউ বিরক্ত না করে।'

'তার মানে সোয়েজারের হাত থেকে বাঁচাবার সময় আপনার মনে এই ছিল?'

খেপে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'সোয়েজার তো একটা শুয়োর।' হঠাৎ নরম গলায় বলল, 'বাদ দিন ওর কথা। এখন শুধু আমি আর আপনি।' খপ করে আমার ডান হাত চেপে ধরল লেফটেন্যান্ট, 'না, বলবেন না, ফ্রাউলিন। আজকের দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাক আমার জীবনে।'

'কি যা-তা বলছেন,' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম, 'এমন বাজে ব্যবহার করছেন কেন আমার সাথে?'

লাফিয়ে কাছে চলে এল লেফটেন্যান্ট। দ্রুত দু'পা পিছিয়ে গেলাম। তখুনি চোখে পড়ল চাবিটা। এই রুমের চাবি। লেফটেন্যান্ট যে চেয়ারে বসে ছিল তার পাশেই কার্পেটের ওপর পড়ে আছে। সাথে সাথে বুদ্ধি খেলল মাথায়। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ঠিক আছে, আমার কথাটা শুনুন আগে।' স্বাভাবিকভাবে গিয়ে চেয়ারে বসলাম। পেছন থেকে হঠাৎ করে এগিয়ে এল লেফটেন্যান্টের মুখ। চকাস্ করে আমার ডান গালে চুমো দিয়ে ফেলল ও। ঝট্ করে মুখ সরিয়ে নিলাম। একটু কঠিন স্বরেই বললাম। 'আপনার চেয়ারে আগে বসুন তো। আমার কথা শেষ হোক, তারপর যা হয় করবেন।'

'ঠিক আছে। শুনছি, ফ্রাউলিন। তারপর করব যা ইচ্ছে। মিটিমিটি হেসে নিজের চেয়ারের দিকে চলে গেল লেফটেন্যান্ট।

সাথে সাথে পা বাড়িয়ে দিলাম। বার দু'য়েকের চেষ্টাতেই চলে এল চাবির রিংটা। যেন হঠাৎ পড়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে ন্যাপকিনটা ফেলে দিলাম কার্পেটে। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ন্যাকপিন তোলার ফাঁকে চাবির রিংটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলাম।

'শুনুন, হের লেফটেন্যান্ট,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'আগে আমার কথাগুলো শুনুন মন দিয়ে।'

আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে পিছোতে লাগলাম। সেই সাথে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছি। কি বলছি, নিজেও জানি না। সারা মন জুড়ে একটাই চিন্তা.

দরজার কাছে পৌঁছোনোর আগে যেন ও উঠে না দাঁড়ায়।

অনন্তকাল পরে যেন পৌঁছোলাম দরজার কাছে। হাত কাঁপছে। ধুকপুক করছে বুকের ভেতর। সুস্থির হবার জন্যে একটু সময় নিলাম। তারপর লম্বা একটা দম নিয়েই ঝট্ করে বের করলাম চাবিটা। তালায় ঢুকিয়ে খুলে ফেললাম দরজা।

লাফিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট। ছুটে আসার আগেই চাবি হাতে বেরিয়ে গেলাম। দ্রুত হাতে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা। দেয়ালে পিঠ রেখে হাঁপাতে লাগলাম।

এক সেকেন্ড পরেই হ্যান্ডেল ধরে ভেতর থেকে মোচড় দিল লেফটেন্যান্ট। খুলল না দরজা। বার কয়েক চেষ্টার পর থামল। একটু পরেই গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গেছে, ফ্রাউলিন। দরজাটা খুলুন।'

বললাম, 'অনেক শিক্ষা হয়েছে একদিনে। আর নয়। চাবিটা বাইরে সেন্ট্রির হাতে দিয়ে সব কথা বলে যাচ্ছি। এখন থেকে চাবিটা সাবধানে রাখবেন। বিশেষ করে বান্ধবী সঙ্গে থাকলে। আচ্ছা, চলি, হের লেফটেন্যান্ট।'

আর্তনাদ করে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'না, না, যাবেন না, ফ্রাউলিন, যাবেন না। এবারের মত ক্ষমা করে দিন। আর এমন হবে না। দরজাটা খুলে দিন।'

আরও কিছুক্ষণ মাফ চাইবার পর খুলে দিলাম দরজা। বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট। চোখমুখ লাল। বলল, 'খুব শিক্ষা দিলেন, ফ্রাউলিন।'

'মনে থাকে যেন।'

'আজীবন মনে থাকবে।'

'আচ্ছা, চলি তাহলে।'

ফিরে এলাম হাসপাতালে। ফেরার পর এত কাজ চাপল যে বাসায় ফিরলাম গভীর রাতে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এখন।

পরদিন সন্ধ্যা নামতেই বেরোলাম। জ্যাপিলীন আক্রমণের খবরটা পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দু'দিন পরে বাইপ্লেনের রিপোর্টের একটা নকল পৌঁছে দিল স্টিফেন। সেদিনই পাঠিয়ে দিলাম ওটা। খবরটা কোডে লেখার সময়ই দেখেছিলাম, বাইপ্লেনের রিপোর্ট ছাড়াও পপারিংগি আক্রমণের দিন-তারিখ লেখা আছে ওতে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলাম ক'টা দিন। অবশেষে এল সেই বিশেষ দিনটা। রাতে ডিউটি ছিল হাসপাতালে। সাতটার সময় আক্রমণ শুরু হবার কথা। ঠিক পৌনে সাতটায় কানে এল প্লেনের মৃদু গুঞ্জন। শব্দটা বেড়ে উঠে গর্জনে পরিণত হতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল। এসে গেছে বৃটিশ এয়ারক্র্যাফট। কিন্তু কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। বৃটিশদের পরিকল্পনা ছিল, রুমবেক এয়ারপোর্টে প্লেনগুলো মাটিতে থাকতেই ধ্বংস করে দেবে ওগুলো। কিন্তু রুমবেকের আকাশে পৌঁছোনোর আগেই আকাশে উঠে গেল জার্মান এয়ারক্র্যাফট্। রুলার্সের আকাশে শুরু হয়ে গেল শিকারি বাজের লড়াই। মেশিনগানের কাপড় ছেঁড়া শব্দ আর বোমার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘরবাড়ি। আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে যেতে একসময় মিলিয়ে গেল শব্দ। জানালা দিয়ে দেখলাম, লাল হয়ে গেছে রুমবেকের আকাশ।

পরদিন খবর পেলাম, দুটো জার্মান বাইপ্লেন আর দুটো বৃটিশ এয়ারক্র্যাফট ধ্বংস হয়েছে। চমকে উঠলাম আরেকটা খবর শুনে। সেই লেফটেন্যান্ট মারা গেছে এই যুদ্ধে। বেচারা সারা জীবনের জন্যেই ছুটি নিয়ে চলে গেল।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কাটল আরও কয়েকটা দিন। হাসপাতালে যাই, আসি আর দিন গুণি। অবশেষে এসে গেল সেই মহালগ্ন : পহেলা অক্টোবর।

www.shopnil.com

সন্ধ্যার মুখে গভীর গর্জন উঠল বাতাসে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। অনেক ওপর দিয়ে তীরের ফলার মত আকৃতি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে জ্যাপলিনগুলো। একে একে গুণলাম। মোট ন'টা। তার মানে সোয়েজারের খবর ঠিকই আছে। বাকি দুটো হয়তো একটু পরেই মিলবে ওগুলোর সাথে। 'গ্রেট ম্যাথি যাচ্ছে লীডার হয়ে,' কথাটা মনে পড়তেই কেন যেন শিউরে উঠল শরীর।

সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। শুধু এপাশ ওপাশ করে কাটল। একটু চোখ লেগে এলেই সামনে লাফিয়ে ওঠে বোমা, আগুন। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষ, চিৎকার করে ছুটছে নারী পুরুষ শিশু। ইট, কাঠ, মাটি ফোয়ারার মত ছিটকে উঠছে আকাশে। সাথে সাথে তন্দ্রা ছুটে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসি। হার্টবিট বেড়ে যায় কয়েকগুণ।

দুঃস্বপ্নের মতই একসময় কেটে গেল রাত। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে খেতে গেলাম।

কেন যেন বহু চেষ্টা করেও জানতে পারলাম না, কি ঘটল ওইদিন। পুরো এক বছর পরে জেনেছিলাম খবরটা। ইতিহাস হয়ে আছে, সেদিন লন্ডনকে রক্ষা করতে কী বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল ইংরেজরা! ওইদিন বৃটিশ লেফটেন্যান্ট টেম্পেস্ট 'এল ৩১' নম্বর জ্যাপলিনকে গুলি করে নামিয়ে দিয়েছিল পোর্টার বারের ওপরে। ওটা ছিল ম্যাথির। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে তার জ্যাপলীনের সাথে সাথে। সুযোগ পেয়েও প্যারাসুট ব্যবহার করেনি। ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যুকেই গ্রহণ করেছিল সে।

কথাটা শুনে সত্যি সত্যি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গিয়েছিল আমার। বীর বন্দনায় দোষ নেই কোন। হোক না সে শত্রু।

কিছুদিন পরে। বিশ্রাম করছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে এলফন্স এল। ওকে এই অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু। নইলে ও তো উত্তেজিত হয় না কখনও।

'রুলার্সের অ্যামুনিশন ডাম্পটা বোধহয় উড়িয়ে দেয়া যায়,' নিচু গলায় বলল এলফন্স।

'বলেন কি?' আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, 'কেমন করে?'

'আপনি এখানে আসার বেশ কিছু দিন আগের ঘটনা। হাসপাতাল কম্পাউন্ডের মধ্যে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা পড়ে বিরাট একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল। ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল, গর্তের নিচে একটা সুরঙ্গ। হাসপাতালের পেছনে কাঠের ঘরটা ওই গর্তটার ওপরেই। জার্মানরা বানিয়েছে, গ্যাস আক্রমণের সময় সেলার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।'

'কিন্তু এর সাথে অ্যামুনিশন ডাম্পের কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে। সুরঙ্গের কথা বললাম না? অ্যামুনিশন ডাম্পের চারপাশে এত কড়া পাহারা যে ওর ফাঁক দিয়ে একটা পিঁপড়েও যেতে পারবে না। হতাশ হয়ে ভাবছিলাম, কি করা যায়। হঠাৎ মাথায় এল, মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া যায় না? সাথে সাথে মনে পড়ল সুরঙ্গের কথা। ছুটলাম লাইব্রেরিতে। বহু খুঁজে পেতে রুলার্সের ওপর লেখা একটা বই বের করলাম। ওতে দেয়া আছে সুরঙ্গের ইতিহাস আর ম্যাপ। দেখে তো খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। সুরঙ্গটা ঠিক অ্যামুনিশন ডাম্পের নিচ দিয়ে গেছে। ম্যাপটা এঁকে নিয়েছি আমি।'

'দারুণ ব্যাপার।' লাফিয়ে উঠলাম, 'এখন কিভাবে কি করবেন?'

'যন্ত্রপাতি যোগাড় করে ফেলেছি,' হেসে বলল এলফন্স, 'পুরো মাসের বেতনই তো প্রায় লেগে গেছে। এখন বাকি মাস আপনার হোটেলে মাগনা খাব।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল।

আমিও যোগ দিলাম হাসিতে। হাসি থামলে বললাম, 'কোন অসুবিধে নেই, খাবেন। কিন্তু সুরঙ্গের ওপরে ঠিক কোন জায়গায় অ্যামুনিশন ডাম্প, বের করবেন কি করে? ধরুন, ভুল হয়ে গেল। দেখা গেল, সেন্ট্রিকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।'

'হতে তো অনেক কিছুই পারে। টাউন কমান্ড্যান্টের মীটিংয়ের টেবিল মাথায় নিয়েও উঠতে পারি। তবে ঠিকমত মেপে নিলে কোন অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।'

'কিন্তু মাপবেন কি করে?'

'কাঠের ঘর থেকে অ্যামুনিশন ডাম্পের সীমানা পর্যন্ত মেপে নেব ফিতে দিয়ে। সীমানা থেকে ডাম্পের দূরত্ব আন্দাজ করতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য, সুরঙ্গটা সোজা গেছে। না হলে মাপামাপি করে কোন লাভ হত না।'

বললাম, 'ঠিক আছে। বরাত ভাল থাকলে অ্যামুনিশন ডাম্পেই পৌঁছুব। কবে শুরু করতে চান?'

'শুভ কাজে দেরি করতে নেই। আপনার অসুবিধে না থাকলে কালকেই।'

'ভালই হলো। কাল বিকেল পর্যন্ত ডিউটি আছে। সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে চলে যাব তাহলে।'

'সন্ধ্যায় নয়। ঠিক রাত ন'টায় যাবেন ওখানে । ভাল কথা, এডমন্ডের দেয়া সেই ডিনামাইট স্টিক দুটো আছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাবে কোথায়?'

'কালকে সাথে করে নিয়ে আসবেন তাহলে।'

চলে গেল এলফন্স।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলাম। ডিউটি শেষ হওয়ার পরেও টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত রাখলাম নিজেকে। যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে। পৌনে ন'টার দিকে ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে রুম থেকে বেরোলাম। নিচে নেমে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিলাম চারপাশ। নাহ্, নেই কেউ। নিঃশব্দে কাঠের ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজায় ঠেলা দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। ভেতরে ঢুকলাম।

'আসুন, ফ্রাউলিন,' অন্ধকারের মধ্যে ভেসে এল এলফন্সের গলা।

চমকে উঠলাম। বললাম, 'অন্ধকারে কাজ করবেন কি করে।'

'মোমবাতি আছে। আপনার আসার শব্দ পেয়ে নিবিয়ে দিয়েছিলাম। একটু অপেক্ষা করুন।'

খশ করে জ্বলল ম্যাচের কাঠি। হাত দিয়ে আড়াল করে ছোট্ট একটা মোমবাতি ধরাল এলফন্স। এক টুকরো টিন বাঁকিয়ে ঘিরে দিল। পাশ থেকে কাগজ তুলে নিয়ে আঠা মাখাতে লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি?'

'জানালায় লাগাব। বাইরে থেকে যাতে আলো দেখা না যায়।'

জানালায় কাগজ লাগানো শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কাজ শেষ হলে টর্চ জ্বালল এলফন্স। বলল, 'মেঝের এখানে আলোটা ধরে থাকুন।' একটা জায়গা দেখিয়ে ঘরের কোণ থেকে শাবল নিয়ে এল।

আলো ধরে থাকলাম। শাবল দিয়ে গোটা কয়েক ঘা দিতেই ভেতরে ঢুকে গেল শাবল। চাড় দিল এলফন্স। কঁর্ক শব্দ করে উঠে এল তক্তা। গোটাদু'য়েক তক্তা ওঠানোর পরে একজনের নামার মত ফাঁক হলো।

টর্চ ধরে থাকলাম। লাফিয়ে নেমে গেল এলফন্স। টর্চ, দড়ি, কাঠ, শাবল সব ওর হাতে দিয়ে ঝুলে পড়লাম। আস্তে করে নামিয়ে নিল ও।

www.shopnil.com

'টর্চটা ধরুন তো আবার,' নামতেই বলল এলফন্স, 'মই তৈরি করতে হবে।'

পেরেক দিয়ে তক্তার সাথে কাঠের ছোট ছোট টুকরো আটকে তৈরি হলো মই।

এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলল এলফন্স। একটু পরেই পাওয়া গেল সুরঙ্গটা।

জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুরঙ্গের বদ্ধ ভারি বাতাসে কটু গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে। শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠল! মনে হলো, সামনে হিংস্র কোন শ্বাপদ ওত পেতে বসে আছে। আলো নিবলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

ইটের গাঁথুনি সুরঙ্গে। এখনও মজবুত। তবে বহুদিনের ময়লা আর চোঁয়ানো পানিতে ভয়ানক পিচ্ছিল। সোজা হয়ে হাঁটাই যায় না। পিছলে যেতে চায় পা।

কিছুদূর এগোনোর পর কাউকে আর আলাদা করে চেনার উপায় রইল না। কাদা আর ঝুল মেখে ভূত হয়ে গেলাম।

দেয়ালের গায়ে দড়ি ধরে ধরে এগোচ্ছি। পঁচিশ গজ লম্বা দড়ি। পঁচিশ, পঞ্চাশ, পঁচাত্তর···। এগোচ্ছি এভাবে। চামচিকে ছুঁচোদের বহু বৎসরের একচ্ছত্র রাজত্বে হামলা হতেই পালাতে শুরু করল ওরা। সড়সড় করে যখন পায়ের নিচ দিয়ে দৌড়ে পালায়, তখন কেঁপে ওঠে শরীর। মাঝে মাঝে দু'একটা লাফিয়ে গায়ে উঠে পড়ে। তখন কি করে যে চিৎকার ঠেকাই, সে আমিই জানি। টর্চের আলো পড়ে ওদের কুতকুতে চোখগুলো ঝক্ করে জ্বলে ওঠে।

'এসে গেছি,' হঠাৎ থেমে গেল এলফন্স।

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি জিনিসগুলো নিয়ে আসি।' আমাকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে রেখে চলে গেল এলফন্স। সাথে সাথে আতঙ্ক গ্রাস করল আমাকে। মনে হলো, এখুনি লাফিয়ে এসে টুঁটি চেপে ধরল বুঝি কেউ। একসময় মনে হলো, দেয়ালটা যেন চেপে আসছে। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। অনন্ত কাল পরে যেন আলো দেখলাম। এলফন্স আসছে। টর্চের আলোর পেছনে ওর অস্পষ্ট অবয়ব। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল কাছে।

মইটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছাদের কাছাকাছি উঠে গেল এলফন্স। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে খুব সাবধানে কাটা শুরু করল ছাদ।

নিচ থেকে আলো ধরে থাকলাম আমি। বদ্ধ জায়গায় বোমা ফাটার মত আওয়াজ হচ্ছে হাতুড়ির। মনে হলো, পুরো ক্লার্সের লোকজন জেনে গেছে, কি হচ্ছে সুরঙ্গে।

একটু পরেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল বালি আর সুড়কি। সরে যেতে না যেতেই প্রচণ্ড আওয়াজে বড়সড় একটা চাঙড় খসে পড়ল ছাদ থেকে। সরতে আধা সেকেন্ড দেরি হলে পিষে ফেলত একেবারে।

তাড়াতাড়ি মই সুদ্ধ সুরঙ্গের ভেতর দিকে সরে গেলাম। কেউ টের পেয়ে গেলে অন্তত দেখতে পাবে না আমাদের।

অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। কোন সাড়াশব্দ নেই। তার মানে, টের পায়নি কেউ। মইটা ফুটোর মুখে লাগাল এলফন্স। বলল, 'আপনি তো হালকা পাতলা আছেন। আস্তে করে মাথাটা গলিয়ে দেখুন তো, কোথায় এলাম।'

শক্ত করে মই ধরে থাকল এলফন্স। নিঃশব্দে উঠে গেলাম। খুব সাবধানে মাথাটা তুললাম। এমনভাবে টর্চ জ্বাললাম যেন খুব সামান্য আলো আসে ওপরে। ওই আলোতেই দেখলাম, গুদাম ঘর একটা। গর্তটা হয়েছে ঘরের ঠিক কোণে। মাপে সামান্য এদিক ওদিক হলেই কপালে দুঃখ ছিল।

আস্তে করে নেমে এলাম।

'কি দেখলেন?' উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল এলফন্স।

'ঠিক জায়গাই মনে হচ্ছে। ডিনামাইট স্টিক দুটো দিন।'

খুব সাবধানে স্টিক দুটো পকেটে পুরে ওপরে উঠে গেলাম।

অন্ধকার খানিকটা সয়ে আসার পর আরও ভাল করে দেখা গেল সব। সারা ঘর জুড়ে প্যাকিং বাক্স, টিন, ড্রাম, দড়ি, আরও কি কি যেন সব। যুতসই জায়গা দরকার এবার। ডিনামাইট স্টিক দুটো বসাতে হবে।

খোঁজার কাজে এতই মগ্ন ছিলাম যে কখন যে খালি একটা টিনের কাছে এসে গেছি, খেয়ালই করিনি। একটু পিছিয়ে আসতেই ঝনঝন্ করে উল্টে গেল টিনটা। সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। প্রায় লাফিয়েই নামলাম সুরঙ্গে। সাথে সাথে মইটা নিয়ে সরে এল এলফন্স।

তালা খোলার শব্দ পেলাম ওপরে। তারপরেই দু'জোড়া বুটের আওয়াজ।

'কে ওখানে?' ভেসে এল একজন সেন্ট্রির গলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল, 'ধুৎ, এখানে কে আসবে? কেমন করে টিন রেখেছিল শালারা, পড়ে গেছে এখন। চল।'

মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ। দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ পেলাম।

আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করে বললাম, 'চলুন।'

আবার জায়গামত লাগানো হলো মই। তরতর করে উঠে গেলাম। খুব সাবধানে হাঁটতে শুরু করলাম এবার। এখন কোন শব্দ হলে আর রক্ষে নেই। ঠিক বুঝে ফেলবে ওরা।

খোলা একটা প্যাকিং বাক্স চোখে পড়ল। আস্তে করে ওপরের খড় সরালাম। দেখলাম, হাই এক্সপ্লোসিভ শেল। চমৎকার। আসল জায়গা পেয়ে গেছি। ডিনামাইট স্টিক দুটো বাক্সে রেখে ফিউজ অয়্যার লাগালাম। তার ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে গেলাম গর্তের কিনারায়। তার নামিয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম নিচে। মাথার ওপর ঝুলতে থাকল তার।

হাতুড়ি-ছেনি, মই দূরে রেখে এল এলফন্স। বলল, 'আপনি যতদূর পারেন চলে যান। ফিউজ ওয়্যারটা খুব ছোট। আগুন দেয়ার পর বেশি সময় পাওয়া যাবে না।'

টর্চ ধরে থাকল ও। এগিয়ে গেলাম আমি। বেশ অনেকটা এগোনোর পরে থামলাম।

দূর থেকে আবছামত দেখা যাচ্ছে, নড়াচড়া করছে কিছু। একসময় আগুনের আভাস দেখা গেল। তারপরই ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল ওটা। সাথে সাথে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতে লাগল টর্চের আলো। ফিউজে আগুন দিয়েছে এলফন্স।

একটু পরেই মালপত্র নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গেল ও। ছুটলাম পিছু পিছু। পিচ্ছিল মেঝেতে বেশ কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে ছুটলাম আবার।

শ'দুয়েক গজ যাবার পরেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারপাশ। প্রচণ্ড ধাক্কা দিল গরম বাতাস। ছোটখাট ইটের টুকরো খসে পড়ল ছাদ থেকে। আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে নাকি? বেড়ে গেল ছোটার গতি।

প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই সপ্ত নরক ভেঙে পড়ল একসাথে। একের পর এক বিস্ফোরণ। প্রত্যেকটাই যেন আগেরটার চেয়ে ভয়ঙ্কর।

থরথর করে কাঁপছে দেয়াল মেঝে ছাদ। তার মধ্যে দিয়ে পাগলের মত ছুটছি। হুমড়ি খেয়ে পড়ি, আবার উঠে দাঁড়াই। কাঠের ঘরটার নিচে যখন পৌঁছুলাম, জিভ ততক্ষণে হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু ওপরে না ওঠা পর্যন্ত নিরাপদ নই। মই লাগিয়ে শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে উঠলাম ওপরে। উঠেই সটান শুয়ে পড়লাম মেঝেতে। পুরো ক্লার্স কেঁপে কেঁপে উঠছে তখনও।

www.shopnil.com

আধঘণ্টা খানেক পরে উঠতে পারলাম। কোনরকমে গা হাত-পা পরিষ্কার করে পোশাক বদলে নিলাম। অতিরিক্ত একসেট পোশাক আনার বুদ্ধিটা এলফন্সই দিয়েছিল। ওগুলো না থাকলে যে কি হত ভেবে শিউরে উঠলাম। ময়লা পোশাকগুলো বান্ডিল বানিয়ে ফেলে দিলাম গর্তে। মেঝের তক্তাগুলো পেরেক দিয়ে আগের মত আটকে দিল এলফন্স। যন্ত্রপাতিগুলো ঘরেই রেখে দিল। সুবিধা মত নিয়ে যাবে এক সময়। বেরোনোর আগে জানালায় লাগানো কাগজগুলো তুলে ফেলল এলফন্স।

গভীর রাত। নিঃশব্দে পৌঁছোলাম বাড়িতে। জেগেই ছিল মা। আমাকে দেখেই দরজা খুলে দিল। ঢুকে সোজা বেডরুমে। পোশাক-টোশাক নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। এখন গোসল না করলে স্রেফ মারা যাব।

বাথরুমে ঢুকে ঘড়ি খুলতে গিয়ে দেখি, নেই ওটা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সোনার ঘড়ি ছিল। বাবা শখ করে এক জন্মদিনে দিয়েছিল। কোথায় গেল ঘড়িটা?

গোসল করার পর একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। কিন্তু রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে। গপাগপ করে গেলা শুরু করলাম। মা জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো আজকে, মার্থা?'

'অ্যামুনিশন ডাম্প উড়ে গেছে।'

'তাই নাকি?' খুশি হয়ে উঠল মা, 'নিশ্চয়ই কোন বেলজিয়ানের কাজ?'

'তা তো বটেই! তোমার মেয়ে যখন বেলজিয়ান তখন এ কাজ বেলজিয়ানের না হয়ে যাবে কোথায়,' খেতে খেতে বললাম আমি।

বারো

সপ্তাহ দু'য়েক পরে নতুন লোক এল হাসপাতালে। পাঁচজন নার্স আর একজন মেট্রন। সবাই জার্মান। কেন যেন প্রথম থেকেই ওরা খারাপ ব্যবহার শুরু করল আমার সাথে। হয়তো হাসপাতালে সবাই ভালবাসত আমাকে; সে কারণে ঈর্ষা। কে জানে!

সবক'টা আনাড়ি। এক কাজে পাঁচবার ভুল করে। আর ভুল হলেই এক ছুতোয় দোষ চাপায় আমার ঘাড়ে।

একদিন ওবার্তাজ ডাকলেন। ঘরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পর চোখ তুললেন ওবার্তাজ, 'ওরা তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করছে, তাই না?'

অন্য সময় হলে হয়তো না-ই বলতাম। কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ওরা।

ওবার্তাজ তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝলেন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। বিষাদ মাখা গলায় বললেন, 'এ লজ্জা আমি রাখব কোথায়? ওরা আমার কাছেও নালিশ করেছে তোমার নামে। আমি তো তোমাকে চিনি, কিন্তু আমারও যে হাত-পা বাঁধা। তুমি বেলজিয়ান। তোমার হয়ে কিছু বলতে গেলেই নানা রকম সন্দেহ করবে সবাই। তুমি সাবধানে থেকো।'

চলে এলাম। মুখ বুজে সহ্য করলাম আরও কিছুদিন। একদিন সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অনেক হয়েছে, আর নয়। সিদ্ধান্ত নিলাম, হাসপাতাল ছেড়ে দেব।

সেদিনের ডিউটি শেষ করে সোজা ঢুকলাম ওবার্তাজের রুমে। কি যেন পড়ছিলেন উনি। আমার মুখ দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা ঘটেছে। তাড়াতাড়ি

কাগজটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল কথাটা বলতে। অনেক কষ্টে বললাম, 'কাল থেকে আমি আর আসব না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন ওবার্তাজ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'তুমি আমার নিজের মেয়ের মত। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

চোখে জল এসে গেল। মাথা নিচু করলাম তা লুকোতে। কি যেন ঠেলে উঠল গলার কাছে। ভেজা গলায় বললাম, 'আপনার কথা আমি ভুলব না কোনদিন। কখনও দরকার হলে জানাবেন। যে করেই হোক আসব আমি।'

ঝাপসা হয়ে গেল চারপাশ। প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এলাম। দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা।

নভেম্বরের শেষ। সপ্তাহ দু'য়েক হলো হাসপাতাল ছেড়েছি। বাড়িতেই বসে থাকি এখন। ফলে খবর-টবরও আর জোগাড় হয় না তেমন।

বিকেল। ঘুরতে বেরিয়েছি। টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চোখ পড়ল বিজ্ঞপ্তিটার ওপর। চোখ বুলিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় এসে হঠাৎ আঠার মত সেঁটে গেল চোখজোড়া। তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করলাম। বড় বড় অক্ষরে লেখা, "হারানো প্রাপ্তি।" নিচে ছোট করে লেখা,

'নিম্নলিখিত হারানো অথবা চোরাই মাল উদ্ধার করা হইয়াছে। মালিককে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া বেলা দশটা হইতে বেলা বারোটার মধ্যে টাউন কমান্ড্যান্টের অফিস হইতে জিনিসগুলি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।'

নিচের দিকে জিনিসগুলোর তালিকা দেয়া। চার নম্বরে আছে, 'একটা সোনার হাত ঘড়ি। পেছনে এম. সি. লেখা।'

সাথে সাথেই বুঝলাম, আমার হাত ঘড়ি ওটা। ভীষণ আনন্দ হলো। বাবার দেয়া ঘড়ি। আমার অত্যন্ত প্রিয়। মাথার মধ্যে অন্য কোন চিন্তাই এল না। সারারাত ছটফট করে কাটল, কখন দশটা বাজবে!

গড়িয়ে গড়িয়ে দশটা বাজল একসময়। ছুটলাম টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসে।

'আসুন, আসুন, ফ্রাউলিন,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল টাউন কমান্ড্যান্ট, 'এই সকাল বেলায় কি মনে করে?'

'আপনার অফিসের বাইরে বিজ্ঞপ্তি দেখে এলাম। সোনার ঘড়িটা বোধহয় আমার।'

'আপনার?' হাঁ হয়ে গেল টাউন কমান্ড্যান্ট। চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তখনও ভেবে পেলাম না, এত অবাক হবার কি আছে।

'তাইতো,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কমান্ড্যান্ট, 'এম. সি.। মানে, মার্থা নোকার্ট (Martha Cnockart)।' টেবিলের ড্রয়ার খুলে ঘড়িটা বের করল। আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটাই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই,' খুশিতে বাগবাগ হয়ে বললাম। ঘড়িটা আলাদা করে তার ড্রয়ারেই রাখা ছিল কেন, একবারও মাথায় এল না।

'আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস এটা,' ঘড়িটা ব্যাগে রাখতে রাখতে বললাম, 'কেমন করে যে হারাল, বুঝতেই পারলাম না। যাক, আপনাদের দয়ায় ফিরে পেলাম আবার।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘড়ি ফিরে পাবার আনন্দে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না তখনি। দু'জন বান্ধবীর

www.shoptil.com

বাসায় গেলাম। প্রথমেই জানালাম ঘড়ি ফিরে পাবার খবর। তারপর অন্য কথা। বেশ বেলা হয়ে গেল ফিরতে ফিরতে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে মা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। ভয় পেয়ে গেলাম। কি হলো আবার? কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মা বলল, 'জার্মান মিলিটারি পুলিস এসেছিল তোর খোঁজে।'

ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। ওরা এল কেন? মা-কে শান্ত করার জন্যে বললাম, 'ও কিছু না। কোন দরকার পড়েছিল হয়তো। ও নিয়ে ভেবো না তুমি।' নিজে কিন্তু ভাবনার অতলে তলিয়ে গেলাম। কি হলো?

প্রায় তিনটের দিকে নক্ হলো দরজায়। খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল নেলী। আমার বান্ধবী। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জার্মান ডিটেকটিভরা এসেছিল আমার কাছে। তোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন?'

'এই মাত্র। ওরা চলে যেতেই রওনা দিয়েছি আমি। সাবধানে থাকিস।' বলেই চলে গেল ও। আমাকে আতঙ্ক আর চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে।

মায়ের মুখ বিবর্ণ। সাহস দেব কি, নিজেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছি। হলোটা কি? ফাঁস হয়ে গেল সব? ধরা পড়ে আমার নাম বলেছে কেউ?

চারটের দিকে দমাদ্দম ধাক্কা শুরু হলো দরজায়। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকল একদল মিলিটারি পুলিস। সামনে একজন অফিসার। ধাক্কা এড়াতে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম।

'আপনার বাড়িটা সার্চ করব,' কঠিন স্বরে বলল অফিসার, 'চলুন আমাদের সাথে।'

মিলিটারি পুলিস দেখে পিলে চমকে গেল। মনে হলো, আমার হার্টবিটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সবাই। কোনরকমে বললাম, 'তা করুন। কিন্তু বে-আইনী কিছু পাবেন বলে মনে হয় না।'

'আমিও তাই আশা করি, ফ্রাউলিন,' শীতল গলায় বলল অফিসার। বাকিদের ইশারা করল কাজ শুরু করতে।

নিচতলায় কিছু পেল না ওরা। দোতলায় উঠল। শোবার ঘরে ঢুকল প্রথমে। তখনই কথাটা মনে পড়ল আমার। রাতে পাঠাব বলে একটা খবর লিখে রেখেছি। টেবিলে আছে কাগজটা। মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল চোখের সামনে। শেষ। সব শেষ। কানে ভেসে এল লাসেলের গলা, 'যদি কখনও ধরা পড়ো, জানবে নিজের দোষেই ধরা পড়েছ।'

থরথর করে কাঁপছে হাত-পা। দাঁত চেপে আছি কাঁপুনি থামাতে। একমনে প্রার্থনা করে যাচ্ছি ঈশ্বরের কাছে। কাগজটা যেন ওদের চোখে না পড়ে।

একটু পরেই সিঁড়িতে বুটের শব্দ হলো। দ্রুত নেমে আসছে কেউ। চোখ তুললাম। অফিসারটা। হাতে সেই কাগজ।

এক ফুৎকারে যেন নিবে গেল আমার সমস্ত আশা-ভরসা। সব শেষ।

হুঙ্কার ছাড়ল অফিসার, 'এটা কি?' আমার চোখের সামনে নাচাতে থাকল কাগজটা।

সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলাম কাগজটার দিকে। ওটা আমার মৃত্যুর পরোয়ানা!

'অ্যারেস্ট করো,' হাঁক ছাড়ল অফিসার, 'নিয়ে চলো টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসে।'

চললাম ওদের সাথে। বন্দী হিসেবে। সমস্ত বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে। মায়ের কান্না আর বিলাপ, পাড়া-পড়শীর অবাক ভয়ার্ত দৃষ্টি কিছুই স্পর্শ করল না

আমাকে। সারা মন জুড়ে একটা কথাই শুধু ঘুরছে, 'এ-কি হলো। এই কি জীবনের শেষ? এই যাওয়াই কি আমার শেষ যাওয়া?'

টাউন কমান্ড্যান্টের রুমে ঢুকলাম। অফিসার কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওর বেডরুমে পাওয়া গেছে এটা।'

মনোযোগের সাথে কাগজটা কিছুক্ষণ দেখল টাউন কমান্ড্যান্ট। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, 'জার্মান আয়রন ক্রস পাওয়া নার্স মার্থা নোকার্ট যে স্পাই, এ কথাও বিশ্বাস করতে হলো!'

ওখানেই আমাকে চার্জ করা হলো স্পাই হিসেবে। একটা কাগজে সই করে দিল টাউন কমান্ড্যান্ট। অফিসার আমাকে নিয়ে চলল রুলার্স মিলিটারি জেলে। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে থাকতে হবে ওখানে।

ভ্যানে করে যাচ্ছি। দু'চোখ মেলে শেষ বারের মত দেখছি সব। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস। এত সুন্দর সবকিছু? ওই যে চড়ুইটা উড়ে গেল গাছ থেকে ছাদে, আর হয়তো দেখব না কোনদিন। রাস্তায় হাঁটছে লোকজন, মায়ের কোলে হাসছে শিশু, সব নিষিদ্ধ এখন আমার জন্যে। জলে ভরে এল চোখ। মুছে ফেললাম তাড়াতাড়ি। ওদের কাছে নিজেকে ছোট করব না কখনও।

জেলে পৌঁছোলাম। নেমে ভেতরে ঢুকলাম। খবর পেয়ে ছুটে এল জেলর। দেখলাম, এয়ারপোর্টের সেই ফিল্ডওয়েবল সোয়েজার। আমাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। কিন্তু কাছে আসতেই বুঝতে পারল সব। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো যেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। একসময় বিষণ্ণ গলায় বলল, 'মার্থা নোকার্ট তাহলে স্পাই!'

সেলটা অত্যন্ত ছোট। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এক কোণে একটা খাট। আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ঘটাং করে বন্ধ করে দিল দরজা।

পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা আমার সমস্ত স্থৈর্য-দৃঢ়তা কান্না হয়ে গলে গলে ঝরল। চোখের জলে ভিজে গেল বালিশ। আর কারও কথা নয়, শুধু নিজের কথাই বারবার মনে হলো আমার। বড় সুন্দর মনে হলো এই পৃথিবী, এই বেঁচে থাকা। তবু কি সব ছেড়ে যেতে হবে?

দিন কয়েক কেটে গেছে। ঘেন্ট মিলিটারি জেলে আনা হয়েছে আমাকে। আনার পর থেকে শুরু হলো ইন্টারোগেশন। কুৎসিত চেহারার এক ডিটেকটিভ নেমেছে এ কাজে। মেয়ে বলেই হয়তো শারীরিক নির্যাতন করেনি এখনও। কিন্তু করতে কতক্ষণ। প্রথম দিন নিয়ে গেল ছোট্ট একটা ঘরে। কাঠের একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার আছে শুধু। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে ঘরে।

সারাদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলল। কবে থেকে এ কাজ করছি, কিভাবে খবর জোগাড় করি, কার কাছে পৌঁছে দিই, আর কে কে আছে এ কাজে—তাদের নাম ঠিকানা। হাজারটা প্রশ্ন। একেবারে ঠোঁট সেলাই করে বসে থাকলাম। দ্বিতীয় দিন আবার ঢোকাল সেই ঘরে। সারাদিন সারারাত চলল জিজ্ঞাসাবাদ। একজন চলে যায় তো আরেকজন আসে। বেশির ভাগ সময়ই থাকে ওই ডিটেকটিভটা। কখনও ভয় কখনও লোভ দেখিয়ে চলল ওরা সারাক্ষণ।

শেষের দিকে শরীর আর বশে রইল না। কিন্তু মনের গভীরে তখনও কে যেন বলে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ো না, ভেঙে পড়ো না। মনের জোরেই বোধহয় মুখ খুলিনি। কিন্তু শেষ রাতের দিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরল সেলে, সকালে।

www.shopnil.com

www.shopnil.com

দুপুরের দিকে আবার নিয়ে গেল ইন্টারোগেশনের জন্যে। আজকের প্রশ্নগুলো কানেই ঢুকল না আমার। একসময় দেখলাম সেলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে।

খাবার দিয়ে গেল ওয়ার্ডেন। ছুঁয়েও দেখলাম না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, অনশন ধর্মঘট করব।

সন্ধ্যায় এল ওয়ার্ডেন। কিছুই খাইনি দেখে অবাক হলো ও। চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'খাবেন না, ফ্রাউলিন?'

চোখ তুললাম শুধু। কোন উত্তর দিলাম না। পাত্রগুলো নিয়ে চলে গেল ওয়ার্ডেন। একটু যেন দুঃখ নিয়েই। রোজ চলল এভাবে।

দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। পেটের মধ্যে অসহ্য জ্বালা। তবুও ঠিক করেছি, প্রতিজ্ঞা ভাঙব না। এত দুঃখ, এত কষ্টের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা আছে আমার। লাসেল, এলফন্স, ক্যান্টিন-মা, এরা ধরা পড়েনি। পড়লে এত জিজ্ঞাসাবাদ করত না ওরা।

দিন কয়েক পরে হাল ছেড়ে দিল ডিটেকটিভরা। বুঝল, এভাবে হবে না। সেজন্যে নতুন ফন্দি বের করল।

এক বেলজিয়াম মেয়ে, এক ডিটেকটিভের রক্ষিতা। মেয়েটা জানত না যে ওর এই পরিচয় আগেই জেনেছি আমি। একদিন সে এসে ঢুকল সেলে।

'আপনার দেখাশোনার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে আমাকে,' হাসিহাসি মুখে বলল মেয়েটা। খুব আন্তরিকভাবে গল্প শুরু করল। কোন উত্তর দিলাম না। অসহ্য লাগছে ওর উপস্থিতি। বক বক করেই চলেছে ও। একসময় ফিসফিস করে বলল, 'জানেন, ওই ডিটেকটিভ লোকটা কিন্তু সাংঘাতিক। ওকে কোন কথাই বলবেন না। কিন্তু ও ব্যাটা যেমন, কিছু না বলা পর্যন্ত ছাড়বে না আপনাকে। কি যে হয় এখন!' যেন আমার চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না ওর, এমন ভাব নিয়ে চুপচাপ থাকল খানিকক্ষণ। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন। ছোটখাট কিছু বলুন আমাকে। আমি তা থেকে একটা কিছু বানিয়ে নিয়ে বলব ওদের। তাহলে অন্তত কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারবেন।' মেয়েটা উঠে এল বিছানার কাছে।

শরীরে শক্তি নেই। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কোনরকমে বললাম, 'আমি জানি না কিছু। বিরক্ত কোরো না আমাকে।'

'কিছু বললে ওরা কিন্তু ছেড়ে দিত আপনাকে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। খেঁকিয়ে উঠলাম, 'ভাগ্ এখান থেকে। নষ্টা মেয়ে কোথাকার! তোর ডিটেকটিভের সঙ্গে শুয়ে থাকগে যা।' রাগের চোটে যা কোনদিন বলিনি, তাই বলে ফেললাম।

লাল হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ। চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'কি বললে? ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব।'

'ভাগ,' শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল মেয়েটা। ডিটেকটিভের কাছেই হয়তো।

দিন কয়েক কাটল এভাবে। অনশনে আরও খারাপ হয়ে গেল আমার অবস্থা। বিছানা ছেড়ে নড়তে পর্যন্ত পারি না। কতবার যে জ্ঞান হারিয়েছি এর মধ্যে, নিজেও জানি না।

খবরটা চলে গেল জেলরের কাছে। একটু পরেই ডাক্তার এল। সব শুনে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে বলল, 'শরীরের যে অবস্থা দেখছি তাতে আর দু'একদিন এভাবে চললে মারা যাবে। এখন যদি নিজের ইচ্ছেয় না খাও তবে টিউব ঢুকিয়ে খাওয়ানো হবে তোমাকে। দেখো মেয়ে, শুধু শুধু না খেয়ে নিজেকে কষ্ট

দিয়ে কি লাভ? বিচারে যা হবার তা তো হবেই।' শেষের কথাগুলো নরম গলায় বলল ডাক্তার।

ডাক্তার চলে যাবার পর কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, আসলে অনশন করে লাভ নেই। কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে অনশন? আর নিজে না খেলে জোর করে খাওয়াবে ওরা। তাছাড়া যা-ই হোক না কেন, বিচার তো হবেই।

দুপুরে খাবার দিয়ে গেল। এক গ্লাস কমলার রস পাঠিয়েছে আজ। হয়তো ডাক্তারেরই পরামর্শে। অনশন ভাঙলাম।

কিন্তু অনশন ভাঙার পরেও ভাল হলো না শরীর। আরও দুর্বল হয়ে পড়লাম। এদিকে জামাকাপড় যে কতদিন ধোয়া হয়নি তার ঠিক নেই। ময়লা, দুর্গন্ধে ভরা সব কাপড়চোপড়। গা ঘিনঘিন করে পরে থাকতে। একদিন সাবান চেয়ে নিলাম। সেদিনই ভালমত বুঝলাম কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। কাপড়ে কিছুক্ষণ সাবান ঘষতেই বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। মনে হলো, দ্রুত এগিয়ে আসছে মেঝে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখি, ভেজা কাপড়ে শুয়ে আছি বিছানায়।

অবস্থা দেখে জেল কর্তৃপক্ষ বেসামরিক হাসপাতালে পাঠাল আমাকে। ভর্তির দিন থেকেই অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার শুরু করল নার্সরা। যদিও ওরা বেলজিয়ান। অত্যন্ত অবহেলার সাথে দায়িত্ব পালন করতে লাগল। কিছু চাইলে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে কষ্ট দেয় ওষুধ খাওয়ানো কিংবা ইনজেকশন দেবার সময়।

প্রচণ্ড কষ্ট হয়। কাদের জন্যে তাহলে কাজ করলাম জীবন বিপন্ন করে? চোখে জল এসে যায় মাঝে মাঝে। মরে যেতে ইচ্ছে করে। পরে শুনেছিলাম ওদের দুর্ব্যবহারের কারণ। কার কাছ থেকে নাকি শুনেছিল, আমি অসচ্চরিত্র। চুরি-টুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি ইত্যাদি।

মা এল একদিন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনুমতি জোগাড় করেছে।

শুয়ে ছিলাম। মা-কে দেখেই উঠতে গেলাম। মাথাটা উঁচু করতে পারলাম শুধু। বিছানায় বসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল মা। মায়ের দুঃখ চোখের জল হয়ে নামল। জমে থাকল আমার বুকের পাশে। আমার চোখের জলে ভিজে গেল মায়ের পোশাক।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল মা। ভেজা গলায় বলল, 'ঈশ্বরের কাছে কি অপরাধ করেছি আমি যে একে একে আমার সব ছেলে মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন তিনি?'

কাঁপা কাঁপা হাতে চোখ মুছিয়ে দিলাম মায়ের, 'কাঁদছ কেন, মা? দেশের জন্যে মরছি, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি আছে, বলো?'

মায়ের মন কি আর সে কথা মানে?

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল মা। এক সময় একটু সামলে নিল। বলল, 'তোর শরীরে যে কিছু নেই রে!'

মা জানে না যে আমি অনশন করেছিলাম। বললাম, 'অসুখ হয়েছিল, মা। ভেবো না তুমি। ভাল হয়ে যাব শিগগিরই।' আস্তে করে মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কেমন আছে?'

সাবধানে চারপাশ দেখে নিল মা। ফিসফিস করে বলল, 'এলফন্স আর স্টিফেন এসেছিল কাল। ওদেরকে এখনও সন্দেহ করেনি কেউ। তোর জন্যে কিছু করতে পারছে না বলে খুব কষ্টে আছে ওরা।'

'ওবার্তাজ কিছু বলেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এলফন্স বলল, তিনিও নাকি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন তোর কথা শুনে।'

বুটের শব্দে চমক ভাঙল। এগিয়ে এল একজন অফিসার, 'সময় হয়ে গেছে।'

মায়ের চোখে আরও ঘন হলো বিষাদ। আমাকে চুমো খেয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মা।

বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট! কাঁদতে চাইছি কিন্তু শক্ত হয়ে জমে আছে কান্না। আমি তো জানি কি ভাবছে মা। সত্যি কিনা, নিজেও জানি না। হয়তো এ-ই শেষ দেখা।

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল মা। চোখ মুছতে মুছতে রওনা হলো। দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকাল একবার। হয়তো শেষ বারের মত দেখল তার আদরের মেয়েকে।

মা চলে যেতেই আমার বুকের সমস্ত কষ্ট বৃষ্টি হয়ে নামল চোখে।

অনেকগুলো পায়ের শব্দে বালিশ থেকে মুখ তুললাম। সাদা সাদা কতকগুলো মূর্তি নড়াচড়া করছে চারপাশে। ঝাপসা। টপ করে ঝরে গেল অশ্রুর বিন্দু। পরিষ্কার হলো সব। নার্স। প্রায় সবাই এসেছে। ভিড় করে আছে আমার বেডের পাশে। আপনা থেকেই বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'দল বেঁধে এসেছ শাস্তি দিতে? দাও। আমার তো আর হারাবার মত কিছু নেই।'

বিছানায় বসল মেট্রন। আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। অনুতপ্ত স্বরে বলল, 'না জেনে আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছি, সারা জীবনেও সে লজ্জা যাবে না আমাদের। সারা বেলজিয়াম আজ গর্বিত আপনার জন্যে। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বলুন, ক্ষমা করবেন আমাদের?'

তাড়াতাড়ি হাত চেপে ধরলাম ওর। বললাম, 'লজ্জা পাবার কিছু নেই। ভুল করে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার জীবন সার্থক হয়েছে, বেলজিয়ামের জন্যে কিছু করতে পেরেছি বলে।'

অনেক কথা বলল ওরা। আমার সম্পর্কে কি শুনেছিল সব। একসময় বিদায় নিয়ে চলে গেল সবাই।

এর পর থেকে আমার পরম আত্মীয় হয়ে উঠল ওরা। ফাঁক পেলেই এসে গল্প করে। কোনকিছুর দরকার পড়লে কার আগে কে এনে দেবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। আমার জামাকাপড়ও ওরা নিজেরাই পরিষ্কার করে দেয়।

সপ্তাহ দু'য়েক কাটল। অনেক ভাল হয়ে উঠেছি। একদিন শমন এল জেল থেকে। ফেরত যেতে হবে। সাথে সাথে মন খারাপ হয়ে গেল। ওদের সঙ্গ হারালাম। মানুষের সঙ্গ হারালাম। চেনা আকাশ আর বাতাসের গান নিষিদ্ধ হলো আবার।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রিজনার ভ্যানে চলছি জেলখানায়। চোখে ভাসছে নার্সদের মুখগুলো। সবার চোখে অশ্রুর বন্যা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ। ওরা আমাকে এত ভালবেসেছে এ-ক'দিনে?

আবার সেই নির্জন সেল। গার্ডের বুটের একঘেয়ে শব্দ। খটখট, খটখট। পাগল হয়ে উঠি এক এক সময়। মরে যেতে ইচ্ছে করে।

অফুরন্ত সময়। ভাবনার স্রোতে ভাসিয়ে দিই ভেলা। বাবা, মা, লাসেল, ক্যান্টিন-মা। ওবার্ডাজ, স্টিফেন, এলফন্স, তেষট্টি নম্বর, মাদাম স্টার্ম···। কত কথা, কত স্মৃতি। ছবির মত ভেসে ওঠে মনে।

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, রাস্তায় শিশুদের উচ্ছল ছোটাছুটি, পাখির গান, হাওয়ার সঙ্গে পাতার তুমুল মাতামাতি। কোথায় হারিয়ে যায় মন। আবার ফিরে আসে সেলে। খটখট, খটখট।

মনে হয়, কোর্ট মার্শাল হবে আমার। কেঁপে ওঠে বুকের মধ্যে। চোখের সামনে দেখতে পাই সব। সারি সারি জুরি বসে আছে। মাঝখানে বিচারক। নৃশংস চেহারা। কুটিল মুখে রায় দিল, 'মৃত্যুদণ্ড।' বদলে গেল দৃশ্য। বধ্যভূমি। পিছমোড়া করে হাত বাঁধা। সামনে দাঁড়ানো রাইফেল হাতে একসার সৈনিক। আমার চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিল একজন। অন্ধকার হয়ে গেল সব। রাইফেল তোলার শব্দ। বোল্ট টানার শব্দ। চিৎকার করে উঠল একজন, 'ফায়ার!'

কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। কানের পাশ দিয়ে নামছে কুলকুল করে।

দুঃস্বপ্নের মত কাটে দিন। আলো হলে বুঝি সকাল হলো। অন্ধকার নামলে বুঝি রাত্র এল এবার। কতদিন গেল? জানি না।

দুপুর। শুয়ে আছি। ঘুমাইনি। বুটের শব্দ শুনলাম। অন্যরকম। একটু অবাক হলাম। কে এল? কার কাছে এল? এ সময় তো আসে না কেউ!

আমার সেলের সামনে এসে থামল শব্দটা। ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরে। লাফিয়ে উঠে বসলাম। দেখি, এক লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে। হাতে কাগজ। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পড়তে শুরু করল কাগজটা, 'জার্মানী অধিকৃত এলাকার কম্যান্ডিং অফিসারের নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, আগামী সপ্তাহের কোন এক তারিখে আসামী মার্থা নোকার্টের কোর্ট মার্শাল অনুষ্ঠিত হইবে।'

কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে লেফটেন্যান্ট বলল, 'আপনার যদি ডিফেন্স করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আপনার যা যা বলার আছে আমাকে বলতে পারেন।'

'আমি ডিফেন্স করব না,' ছোট্ট করে উত্তর দিলাম।

'আপনি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,' হেসে বলল লেফটেন্যান্ট, 'আপনি চাইলে সিভিল অ্যাডভোকেটও পেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, আমার কাউকে দরকার নেই।'

শ্রাগ করল লেফটেন্যান্ট। একটু নিচু গলায় বলল, 'মিলিটারি আইনে যা-ই থাক, আপনাকে আপনার দেশপ্রেমের জন্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' আমাকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দিয়ে স্যালুট করল লেফটেন্যান্ট। তারপর চলে গেল।

মানুষের মানবিক অনুভূতি তাহলে অবশিষ্ট আছে এখনও?

www.shopnil.com

তেরো

সকাল দশটা। শুয়ে ছিলাম। খটাং করে শব্দ হলো। তারপরই অনেকগুলো বুটের আওয়াজ। এদিকেই আসছে। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। এসে গেছে ওরা! কোর্ট মার্শাল এবার। তার মানে মৃত্যু। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে।

সেলের তালা খুলল গার্ড। ভেতরে ঢুকল একজন অফিসার। মুখের রেখা একটুও না বদলে হুকুম দিল, 'কোর্ট মার্শালে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো।'

বেরিয়ে গেল অফিসার। ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় এল সে। যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করলাম তার সঙ্গে। কোন বোধ নেই, কোন অনুভূতি নেই যেন। একটাই কথা সারা মন জুড়ে, 'এই শেষ, এই শেষ।'

www.shopnil.com

কোর্টে পৌঁছোলাম। লম্বা একটা টেবিল। তার ওপাশে ন'জন বিচারক। মাঝখানে প্রেসিডেন্ট। দু'পাশে চারজন করে বাকি আটজন। গম্ভীর। কঠোর। হঠাৎ করে কেন যেন হাসি পেয়ে গেল। আমার মত একজন মেয়েকে মারবে, তার জন্যে এত আয়োজন?

কাঠগড়ায় উঠলাম। প্রসিকিউটর অনুমতি নিয়ে শুরু করল তার ভাষণ, 'কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অসামীর নাম মার্থা নোকার্ট। জন্মসূত্রে বেলজিয়ামের নাগরিক। যেহেতু বেলজিয়াম এখন জার্মান ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের অধীন, সেজন্যে জার্মান মিলিটারি কোড-এর ধারা অনুযায়ী সে এই আদালতে বিচার যোগ্য।

'আসামী মার্থা নোকার্টের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে দেশদ্রোহী। এ অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে আসামী মার্থা নোকার্ট হাসপাতালের নার্সের মত পবিত্র দায়িত্ব পালনের সময় তার দেশদ্রোহী আচরণের মাধ্যমে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করেছে। আমার কাছে আরও প্রমাণ আছে যে, এই আসামীর প্ররোচনাতেই তার বাবা ক্যাম্লিন কাফে নামক কাফেটি কিনেছিলেন যাতে করে ব্যবসার আড়ালে আসামী আরও ভালভাবে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

'আমাদের গুপ্তচর বিভাগ তাদের অয়্যারলেসে হল্যান্ড থেকে বৃটিশদের উদ্দেশ্যে পাঠানো বেশ কিছু রেডিও মেসেজ ধরতে পেরেছে। তারা জানিয়েছে যে অনেকগুলো সংবাদের সংগ্রাহক হিসেবে "এল" নামক একজনের নাম জানানো হত রেডিওতে। আমাদের ধারণা ছিল, এই "এল" বোধহয় লাসেল। লাসেল যে স্পাই এ খবর আমাদের গুপ্তচর বিভাগ অনেক আগে থেকেই জানে। কিন্তু এই আসামীর শোবার ঘরে তল্লাশি চালানোর সময় "এল" নাম সই করা একটা কাগজ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই আসামীই গুপ্তচর "এল"। কাগজটা আমি আদালতে পেশ করছি।'

প্রসিকিউটর আমার মৃত্যুবাণটা এগিয়ে দিল প্রেসিডেন্টের দিকে। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ কাগজটা দেখল প্রেসিডেন্ট। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এ ব্যাপারে তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

চুপ করে থাকলাম। কিছু বলার নেই আমার। কার কাছে বলব? কেন বলব?

'কিছু বলবে না আসামী,' আবার শুরু করল প্রসিকিউটর, 'কারণ তার বলার মত কিছু নেই। এবার সাক্ষীদের হাজির করতে মহামান্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

'অনুমতি দেয়া হলো,' গম্ভীর গলায় বলল প্রেসিডেন্ট।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল একজন। দেখলাম, আমাকে গ্রেপ্তারকারী সেই অফিসার।

'আপনি আসামীর ব্যাপারে যা যা জানেন বলুন,' অফিসারটার দিকে তাকিয়ে বলল প্রসিকিউটর।

'আমি রুলার্স-এরিয়ার ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের ইন্টেলিজেন্স অফিসার। কিছুদিন আগে আমরা সন্দেহ করে একজন লোককে গ্রেপ্তার করি। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা একটা কাগজ পাই। তাতে "এল" নাম সই করা ছিল। লোকটার কাছ থেকে বহু চেষ্টা করেও আর কোন খবর আদায় করা সম্ভব হয়নি।

'আমরা প্রথমে ধরে নিই, এই "এল" হচ্ছে লাসেল ডেলডঙ্ক। তার সম্পর্কে আমাদের কাছে রাখা ফাইলে দেখতে পাই, আসামী মার্থা নোকার্টের পারিবারিক

বন্ধু সে। আমরা তখন মার্থা নোকার্টের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নিতে শুরু করি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আসামীর বাবার একটা কাফে আছে। আসামী নিজে হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ওখানে আসামীর অত্যন্ত সুনাম আছে। সুতরাং, আমরা তাকে সন্দেহতালিকার বাইরে রাখি।

'রুলার্স অ্যামুনিশন ডাম্প ধ্বংস হবার কিছুদিন পরে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে বিস্ফোরণের জায়গায় খেলতে খেলতে হঠাৎ একটা সুরঙ্গ দেখতে পায়। খবর পেয়ে আমাদের একটা টীম পাঠাই ওখানে। বাচ্চারা যে ফোকর দিয়ে সুরঙ্গটা দেখতে পেয়েছিল, তারা সেটা দিয়ে নেমে যায়। বেশ কিছুদূর গিয়ে তারা একটা কাঠের সিঁড়ি, আর ময়লা দু'বান্ডিল পোশাক পড়ে থাকতে দেখে। এক বান্ডিলে মেয়েদের পোশাক, অন্য বান্ডিলে ছেলেদের, মহামান্য আদালত অনুমতি দিলে জিনিসগুলো দেখানো যেতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিতেই জিনিসগুলো আনা হলো সামনে। দেখেই চিনলাম। আমাদের পোশাক আর এলফন্সের হাতুড়ি, শাবল সব।

'সুরঙ্গটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, এক জায়গায় একটা গর্তের সাথে যোগ আছে সুড়ঙ্গটার। আমাদের লোকজন তখন গর্তের মধ্যে নেমে যায়। খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় তারা মাথার ওপর একটা কাঠের ছাদ দেখতে পায়। তখন যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে ছাদ ফুটো করে ওপরে ওঠে। উঠে ঘরের কোণে হাতুড়ি, শাবল আর ছেনি পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিত হয় যে ওদিক দিয়েই সুরঙ্গে ঢোকা হয়েছিল। খবর নিয়ে জানা যায় যে, ঘরটা একটা টেম্পোরারি সিভিলিয়ন ক্লিনিক। গ্যাস আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোনদিন ব্যবহার না করার ফলে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। আসামী যে হাসপাতালে কাজ করে, তার পেছনেই সিভিলিয়ন ক্লিনিকটা। তখন এই আসামীর ওপর ক্ষীণ একটা সন্দেহ হয়। কিন্তু খোঁজখবর নিতে গিয়ে হের ওবার্তাজ এবং আরও অনেকের কাছে তার অত্যন্ত প্রশংসা শুনতে পাই।

'দিন দু'য়েক পরে আমার এক সহযোগী বিস্ফোরণস্থলের কাছাকাছি একটা সোনার হাতঘড়ি কুড়িয়ে পায়। ঘড়িটার পেছনে এম. সি. অক্ষর দুটো এনগ্রেভ করা দেখে আমার পুরো সন্দেহ আসামী মার্থা নোকার্টের ওপর পড়ে। কারণ তার নামও এম. সি. দিয়েই লেখা হয়। আমি তখন টাউন কমান্ড্যান্টের সাথে পরামর্শ করে একটা ফাঁদ পাতি। কিছু হারানো অথবা চোরাই জিনিস পাওয়া গেছে বলে টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসের দেয়ালে একটা বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে দিই। কতকগুলো মনগড়া জিনিসের সাথে ঘড়িটার বর্ণনাও লিখে দিই ওতে। ঠিক দু'দিনের মধ্যেই ফাঁদ পাতা সার্থক হয়। আসামী টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসে এসে ঘড়িটা নিজের বলে সনাক্ত করে। টাউন কমান্ড্যান্ট আসামীকে ঘড়িটা নিয়ে যেতে দেন। সেদিন আমরা সারাদিন ধরে আসামীর বন্ধুবান্ধব, চেনাশোনা সব লোককে জেরা করি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে আসামীর বাড়িতে তল্লাশি চালাই। সে সময়ই তার শোবার ঘর থেকে ওই "এল" সই করা কাগজটা পাই। সাথে সাথে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে টাউন কমান্ড্যান্টের অফিসে নিয়ে যাই। ওখান থেকে তাকে রুলার্স মিলিটারি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।'

অনুমতি নিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল অফিসার।

'তোমার কিছু বলার আছে?' কঠোর মুখে জিজ্ঞেস করল প্রেসিডেন্ট।

কোত্থেকে জানি না, প্রচণ্ড সাহস আর আবেগ এসে ভর করল মনে। নিজেকে মনে হলো, জোয়ান অব আর্ক।

উঠে দাঁড়ালাম। দৃপ্ত গলায় বললাম, 'আপনাদের কাছে আমার কিছু বলার

ইচ্ছে নেই। প্রয়োজনও নেই। তবু বলছি, আপনাদের কোন অধিকার নেই আমার বিচার করার। আমি বেলজিয়ান। আপনারা জার্মান। যেহেতু আমরা এ-মুহূর্তে আপনাদের পদানত সে কারণে আমার এবং আমার দেশের ওপর বর্বর অত্যাচার করছেন আপনারা। দেশের একজন সন্তান হিসেবে আমি মনে করি, আপনাদের মত আমারও অধিকার আছে দেশের জন্যে যুদ্ধ করার, দেশকে মুক্ত করতে যে কোন ধরনের কাজ করার।

'আপনারা যে কোন মুহূর্তে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। আমার ক্ষমতা নেই প্রতিরোধ করার। ইচ্ছে করলে এখুনি আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাতে পারেন আপনারা।

'কিন্তু আমি বলব, এ বিচার নয়, বিচারের নামে এটা প্রহসন। প্রহসন করে আমাকে হত্যা করতে পারেন আপনারা, কিন্তু মনে রাখবেন, এর পরেও আমার মত হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসবে। বেলজিয়ামের জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে যাবে। আবার আমার দেশের মানুষ দেখবে মুক্ত স্বাধীন বেলজিয়াম।'

থর থর করে কাঁপছে শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বেলজিয়াম দীর্ঘজীবী হোক।'

আমাকে চমকে দিয়ে, ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে একসাথে গর্জে উঠল হাজারটা কণ্ঠস্বর, 'বেলজিয়াম দীর্ঘজীবী হোক।'

বাতাসে ভেসে সে স্বর মানুষের এতদিনের আতঙ্ক আর ভয় ভেদ করে পৌঁছে গেল অন্তরের অন্তস্তলে। আবার গর্জে উঠল সেই অদৃশ্য জনতা, 'বেলজিয়াম দীর্ঘজীবী হোক।'

চিৎকার করে উঠল প্রেসিডেন্ট, 'বন্ধ করো, বন্ধ করো এসব। ভাগিয়ে দাও ওদের।' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ।

হঠাৎ দেখি, একজন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। হাতে একটা কাগজ। কাছে এসে বাড়িয়ে দিল প্রেসিডেন্টের দিকে।

কাগজটা পড়ল প্রেসিডেন্ট। কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। কাগজটা প্রসিকিউটরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হের ডক্টর হার্বার্ট স্টোন আসামীর হয়ে সাক্ষ্য দিতে চান। তাঁকে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি দেয়া গেল।'

চমকে উঠলাম। ওবার্তাজ! ওবার্তাজ আসছেন? আমার হয়ে সাক্ষ্য দিতে? নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমাকে এত ভালবাসেন তিনি? তাঁর দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছি জানার পরেও ভালবাসা অটুট আছে?

জলে ভরে উঠল দু'চোখ। ওঁর কাছে খুব ছোট মনে হলো নিজেকে।

আস্তে আস্তে কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন ওবার্তাজ। প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপনার বক্তব্য শুনব আমরা। কিন্তু মনে রাখবেন, আসামী নিজে তার অপরাধ স্বীকার করেছে।'

'তাতে আমার বক্তব্যের কোন হেরফের হবে না,' গমগমে গলায় বললেন ওবার্তাজ, 'আমি শুধু বলতে এসেছি, আমার অধীনে যতদিন কাজ করেছে, কোনদিন কোন কাজে অবহেলা করেনি সে। তার ব্যবহার, কর্তব্যপরায়ণতা আর সেবার কোন তুলনা খুঁজে পাইনি আমি। সে বহুবার, বহু জায়গায় নিজের জীবন বিপন্ন করেও জার্মান জাতির সেবা করে গেছে।

'তাকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা যেমন আমাদের দেশকে ভালবেসে যুদ্ধ করছি, সে-ও তেমনি তার দেশকে ভালবেসে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সে কথা থাক। একটা কথাই শুধু বলার আছে আমার। তা হলো, আসামী মার্থা নোকার্ট হাসপাতালে কাজ করার সময় যে সেবা

জার্মান জাতির জন্যে করেছে, তার মধ্যে মানুষের সেবা করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।'

একটু থামলেন ওবার্তাজ। ফাঁক পেয়ে একটু বাঁকাভাবে প্রশ্ন করল প্রসিকিউটর, 'আসামীর ওপর আপনার একটু পক্ষপাতিত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। এর কারণটা বলবেন কি?'

মৃদু হাসলেন ওবার্তাজ। বললেন, 'বিজ্ঞ প্রসিকিউটর যা বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝেছি আমি। তিনি যদি ধারণা করে থাকেন যে আমার সাথে আসামীর বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে, তার উত্তরে বলব, আছে। পিতা এবং কন্যার সম্পর্ক সেটা। মার্থা নোকার্টকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি আমি। বিজ্ঞ প্রসিকিউটর যা-ই মনে করুন, কিছুই আসে যায় না তাতে। আরও একটা কথা আমি জানাতে চাই বিজ্ঞ আদালতকে। আসামী মার্থা নোকার্ট তার সেবার জন্যে জার্মান মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক "জার্মান আয়রন ক্রস" লাভ করেছিল। হিজ রয়্যাল হাইনেস "দি ডিউক অব উইটেমবার্গ" মহান জার্মান সম্রাটের পক্ষে এই পদক প্রদান করেছিলেন।

'আমার আর কিছু বলার নেই।'

অনুমতি নিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন ওবার্তাজ। যাবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দুঃখ এবং বেদনা ভরা হাসি। আমিও উত্তর দিলাম কান্নার মত হাসিতে।

ওবার্তাজ চলে যেতেই ফিসফিস করে পরামর্শ শুরু হয়ে গেল বিচারকদের মধ্যে। একসময় সবাই ঝুঁকল প্রেসিডেন্টের দিকে। চাপা গলায় আলাপ চলল কিছুক্ষণ। তারপর সোজা হলো সবাই।

'চারদিন পরে, পঞ্চম দিনে রায় দেয়া হবে,' ঘোষণা করে উঠে দাঁড়াল প্রেসিডেন্ট। সাথে সাথে আর সবাই।

আবার আমাকে নিয়ে গেল জেলখানায়। সেই সেলে। পঞ্চম দিনে আবার এলাম কোর্টে। আজকে রায় দেবে। কি হবে জানিই তো।

বসে বসে অপেক্ষা করছি চূড়ান্ত রায়ের জন্যে। আস্তে করে পাঁচ-শো বছর পিছিয়ে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল জোয়ান অব আর্কের ছবি। একইভাবে বিচারের নামে প্রহসন করে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তাকে। মনে মনে বললাম, 'আমিও যেন তোমার মত বীরত্বের সাথে মরতে পারি।'

ভাবনায় ডুবে ছিলাম। চমকে উঠলাম বাজখাঁই আওয়াজে। একজন অফিসার বলল, 'রায় শোনার জন্যে প্রস্তুত হও।'

নড়েচড়ে বসলাম। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পড়তে শুরু করল প্রেসিডেন্ট, 'কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক, বিশেষ করে সে যদি কোন নারী হয়। কিন্তু তুমি তোমার এতদিনের ক্ষতিকর কার্যাবলীর মাধ্যমে আমার বহু দেশবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়েছ। সেজন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে গুলি করে তোমার দণ্ড কার্যকর করা হবে।'

জানাই ছিল, কি হবে রায়। তবুও থরথর করে কেঁপে উঠল বুকের ভেতরে। অতি কষ্টে স্বাভাবিক রাখলাম মুখ।

রায় পড়া শেষ হতেই চেঁচিয়ে উঠল সেই অফিসার, 'হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির নামে রায় দেয়া হলো। অস্ত্র প্রদর্শন করো।'

ভেতরে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিক খটাশ করে পালন করল তার নির্দেশ।

ফিরে এলাম জেলে। আগের সেলেই। সব তেমনি আছে। শুধু বদলে গেছে

www.shopnil.com

নিজের পরিচয়। এখন কনডেমড প্রিজনার আমি।

জেনেশুনে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করার দুর্ভাগ্য যেন কারও না হয়। প্রতিটা মুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি এল মৃত্যুদূত। পায়ের শব্দ, দরজা খোলার শব্দ হলেই ধড়াস করে ওঠে বুক। এসে গেল নাকি? ঘুমের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠে বসি। কেন যে এখনও পাগল হয়ে যাইনি, ঈশ্বরই জানেন!

একদিন সকালে শুনলাম, দু'জোড়া পায়ের শব্দ। এগিয়ে আসছে আমার সেলের দিকে। ধড়াস ধড়াস করতে লাগল বুকের ভেতরে। পায়ের শব্দ থামল আমার সেলের সামনে। গার্ডের সাথে একজন পাদ্রী। বুঝলাম, আজকের দিনের জন্যে বেঁচে গেলাম। কিন্তু প্রায় এসে গেছে আমার শেষ সময়।

কিছুক্ষণ ধর্মকথা পড়ে গেলেন পাদ্রী। একটা শব্দও কানে ঢুকল না। একসময় দেখি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

পরদিন সকালে এল সেই অফিসারটা। বুঝলাম সব। কেন যেন ভয় পেলাম না। শুধু গভীর দুঃখে ভরে গেল মন। মা বাবা ভাই কাউকে দেখতে পেলাম না আর।

রওনা হলাম। যেতে যেতে চোখে পড়ল ঝরা পাতা, শুকনো ফুলের পাপড়ি, ঘরের কোণে জমে থাকা মাকড়সার জাল। প্রতিটি জিনিস যেন পরম মমতায় ডাকছে আমাকে, আমি আছি, আমরা আছি। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘ। বাইরে মানুষের স্রোত। আবার মুক্ত হবে বেলজিয়াম। মানুষের অধিকার থাকবে, হাসি আনন্দ সব থাকবে। আমিই শুধু থাকব না।

আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। কেউ আমাকে নামতে বলায় চমকে উঠলাম। আরও চমকালাম নেমে। কোথায় এলাম? সেই কোর্টে আবার! এ কি শুরু হলো?

হতভম্ব হয়ে ঢুকলাম। আবার দাঁড়ালাম কাঠগড়ায়। বিচারক ন'জন তেমনি বসে আছে।

উঠে দাঁড়াল প্রেসিডেন্ট। হাতে একটা কাগজ। পড়তে শুরু করল।

কি যে পড়ল, কিছু জানি না। চোখের সামনে দিয়ে তখন ভেসে যাচ্ছে আমার ছেলেবেলার ছবি। মায়ের কোলে শুয়ে আছি। আদর করছে মা। বাবার সাথে বেড়াতে যাচ্ছি। খেলা করছি ছোট ভাইদের সাথে।

হঠাৎ চমক ভাঙল কার যেন স্পর্শে। তাকিয়ে দেখি, সেই অফিসার। জিজ্ঞেস করল, 'রায় শুনেছ?'

অবাক হয়ে তাকালাম প্রেসিডেন্টের দিকে।

'অধিকৃত এলাকার কমান্ডার-ইন-চীফ অনুগ্রহ করে তোমার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। জার্মানীর সর্বোচ্চ সম্মান সূচক পদক "আয়রন ক্রস" পেয়েছিলে বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হলো,' গম্ভীর গলায় বলল প্রেসিডেন্ট। চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

কথাটা প্রথমে মাথায় ঢুকল না আমার। যখন ঢুকল, আনন্দে কেঁপে উঠল শরীর। কিন্তু বিদ্রোহ করল আমার হাত-পা। কি করে যে দাঁড়িয়ে থাকলাম, নিজেও জানি না। ঘোর কাটল সেলে ফিরে। আবার বদলে গেছি আমি। এখন আর কনডেমড প্রিজনার নই।

একঘেয়ে সময় কাটছে। অসহ্য। বন্দী জীবন যে কত কষ্টের এতদিনে বুঝেছি।

সকালে উঠি। মুখহাত ধুয়ে এসে চা খাই। চা, মানে খয়েরি রঙের মিষ্টি গরম পানি। এর কিছু পরে ব্রেকফাস্ট। চা আর জুতোর শুকতলার চেয়ে শক্ত আর শুকনো রুটি। বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি, কি দিয়ে তৈরি করা ওটা।

www.shopnil.com

দুপুরে আসত সুপের নামে বিটসেদ্ধ আর লবণ।

দিন কাটছে, মাস কাটছে। বদলাচ্ছে ক্যালেন্ডারের পাতা। কিন্তু আমার সময় থমকে আছে জেলখানার সেলে। কোন পরিবর্তন নেই এখানে।

দুপুর। বসে বসে ঝিমাচ্ছিলাম। অস্পষ্ট গোলমালের আওয়াজ কানে আসছে। আস্তে আস্তে বেড়ে উঠল শব্দটা। একটু পরে জেলখানার মধ্যেই শুরু হয়ে গেল চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি। লাফিয়ে ছুটে গেলাম দরজার কাছে। বিদ্রোহ শুরু হলো নাকি?

চাবি হাতে ছোটাছুটি করছে কয়েকজন। একজন ছুটতে ছুটতে এল আমার সেলের কাছে। বুঝতে পারলাম না কি হচ্ছে এসব!

দ্রুত হাতে দরজা খুলে দিল লোকটা। চলে যাবার আগে আনন্দমাখা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সবাই মুক্ত এখন।'

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। জার্মানরা জিতেই গেল তাহলে? প্যারিস, লন্ডন সব ওদের দখলে?

হঠাৎ খেয়াল হলো, সেলের দরজা খুলছে যে, সে জার্মান গার্ড নয়। অন্য লোক। তার মানে, তার মানে---। আর ভাবতে পারলাম না। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বহুদিন পর প্রথম আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। তবুও ছুটছি মুক্ত আলোয়, মুক্ত বাতাসে। মুক্ত বেলজিয়ামে মুক্ত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছি। এ আনন্দের কি তুলনা হয়?

থরথর করে কাঁপছে শরীর, উত্তেজনা আর দুর্বলতায়। কোনদিকে যাচ্ছি, কোন খেয়াল নেই। শুধু জানি, মুক্ত আমি। সামনে খোলা রাস্তা।

পেছনে তাকিয়ে দেখি, একদল বৃটিশ সৈন্য। আনন্দে উল্লাসে মাতোয়ারা। টলতে টলতে এগোলাম ওদের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে হাত তুলে কিছু বলতে চাইলাম। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। অস্পষ্ট আলোয় কে যেন ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে। শরীরে তার স্পর্শ অনুভব করলাম। এরপর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলে দেখি, গাছের নিচে শুয়ে আছি। রাস্তার পাশেই গাছটা। ধারে-কাছে কেউ নেই।

অসম্ভব দুর্বল লাগছে। তবু যেতে হবে সামনে। কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। নামলাম রাস্তায়। দু'পা যেতেই কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। ঘুরে দাঁড়ালাম। ট্রাক একটা। সামনে পতপত করে উড়ছে ফ্রান্সের পতাকা। প্রাণপণে হাত নাড়তে শুরু করলাম। ঘ্যাঁচ করে পাশে এসে থামল ট্রাক। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একজন অফিসার।

'আমাকে একটু সামনে পৌঁছে দিন,' কোনরকমে বললাম কথাটা।

'কোথায় যাবেন?'

'রুলার্সে।'

'রুলার্সে কোথায়?'

'ক্যারিলন কাফেতে।'

'ক্যারিলন কাফে?' চমকে উঠল অফিসার, 'আপনি, আপনি মার্থা নোকার্ট?'

'হ্যাঁ।'

লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল অফিসারটা। তাড়াতাড়ি হাত ধরল আমার। প্রায় কোলে করেই তুলে দিল ট্রাকে। অবাক গলায় বলল, 'আপনাকে নেয়ার জন্যেই তো ছুটে এসেছি আমি। ঘেন্ট থেকে টেলিফোনে জানানো হয়েছে আপনার কথা।'

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হলো ট্রাক। সারা রাস্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম। শরীর মন দুটোই প্রচণ্ড দুর্বল। কিছু বোঝার মত ক্ষমতাই নেই এখন।

ঝাঁকুনি দিয়ে থামল ট্রাকটা। চোখ মেললাম। কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। সামনেই ক্যারিলন কাফে। কোত্থেকে যেন প্রচণ্ড শক্তি এসে ভর করল শরীরে। লাফিয়ে নামতে গেলাম। প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। ছুটে এল ফরাসী অফিসার। ধরে ফেলল আমাকে।

লোকজন জড় হয়ে গেছে চারপাশে। আমি যে এত পরিচিত হয়ে গেছি, জানতাম না। এগোচ্ছি ধীরে ধীরে। হঠাৎ করে খুলে গেল কাফের দরজা। মা দাঁড়িয়ে আছে। একটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরই ছুটে এল মা। আর আমি, সেই মার্থা নোকার্ট, বহু জার্মান গোয়েন্দার চোখে ধুলো দেয়া স্পাই, উত্তপ্ত দুপুরে অফুরন্ত হাওয়ার ভেতর কত সহজে একটি আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দী হয়ে গেলাম। মায়ের চোখের জলে আবার আমি হয়ে গেলাম মায়ের আদরের সেই ছোট্ট মেয়ে মার্থা নোকার্ট।

****

Thank You For Visiting
www.shopnil.com

BanglaBook.org

উনিশশো চোদ্দ সালের দোসরা আগস্ট। বেলজিয়াম আক্রমণ করল জার্মানরা, দখল করে নিল পুরো দেশটা।

মিষ্টি মেয়ে মার্থা নোকার্ট। ঘরছাড়া হলো পরিবারের সবার সাথে। কাজ নিল সে হাসপাতালে, নার্সের।

একদিন চুপিচুপি এল পারিবারিক বন্ধু লাসেল। বুকের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দিল ওর কথাগুলো: 'মার্থা, তুমি তো বুদ্ধিমতি মেয়ে। দেশের জন্যে কিছুই কি করার নেই তোমার?'

বদলে গেল মার্থা নোকার্ট। শুরু হলো ওর স্পাই-জীবন। গল্পের চেয়েও শ্বাসরুদ্ধকর সত্য ঘটনা।